# ভাঙনঋতুর উপাখ্যান

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অদ্রীশ বিশ্বাস শ্রদ্ধাস্পদেষু

… the oppressor and the oppressed, the constant opposition to one another, have carried on an uninterrupted, sometimes hidden, sometimes open conflict, a conflict that each time ended either in a revolutionary reconstitution of the entire society or the common ruin of the conflicting classes…

**Communist Manifesto**
Karl Marx

কমিকস নিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে এই উপন্যাসের আইডিয়াটা মাথায় আসে। ওরা আমাদের ব্যবহার করেছে (মানে কমিকস নির্মাতারা) আমরা করিনি এতদিন। এটা এপিক উপন্যাস নয়। আমরা শুধু এপিক উপিস্থিতি নিয়ে বেঁচে থাকি না। আরও অনেক দিক আছে। কমিকস আমাদের সেই না এপিক বেঁচে থাকার জোরটা দ্যায়। আমাদের ছোট বেঁচে থাকাই এই আখ্যানের লক্ষ্যবস্তু। খুবই ছোট যেকারণে, আর কমিক…

**Fantomas contra los vampiros multinacionales** (বহুজাতিক ভ্যাম্পায়ারদের বিরুদ্ধে বেতাল) প্রসঙ্গে **খুলিও কোর্তাসারের** স্পেনীয় টিভিকে দেওয়া সাক্ষাতকার

১

– সৌম্য আমি কিছুতেই বাংলায় কিছু লিখতে পারছি না।

– কীই?

– আমি বাংলায় কিস্‌সু লিখতে পারছিনা।

– তার মানেটা কী?

– মানে আমি খাতা কলম নিয়ে বাংলাভাষায় কিছু লিখতে পারছি না। কখনও খানিকটা লেখা হলেও, মুহূর্তের মধ্যে পাতাটা সাদা হয়ে যাচ্ছে।

– দ্যার! ভাটাস না। শোন, আজ সন্ধেবেলা যাবো।।চলো, পরে কথা হবে।

– খট

– ঘট

বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা টেলিফোন কল। আনুষঙ্গিক তথ্যগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল দিনটা। অর্থাৎ যেদিন ফোনটা করা হয়েছে। একটা বিশেষ দিন আমাদের জাতীয় জীবনে। কীকরে বিশেষ হল?

সহজ! ২০০– সালে এই দিনটায় আমাদের মহামান্য তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী বর্ষাকালীন বইঅমেলার মাঠে, আমাদের পরমারাধ্য কবি শ্রী সানি ওনার হোলিনেস এর রচনাসমগ্র প্রকাশ করেন, ই বই হিসেবে। সেদিনের সেই রোমহর্ষক ভাষণটা মনে আছে তো আমাদের?৭

*আহা সেই দিন! চতুর্দিক টমেটোর খোসার মত লাল। ২টো কি ১টা ঠিক মত না পাকায় একটু সামান্য চাঞ্চল্য রয়ে গেছে তাদের ভেতরে। এরই মধ্যে আমাদের মন্ত্রীবর বলে চলেছেন হাত পা নেড়ে: বন্ধুগণ, সানিওনার যেমন ওঁর নামটা ব্যতিক্রমী করে রেখেছিলেন, ঠিক তেমনি আমরাও ব্যতিক্রমী। আমরা সমস্ত অক্ষরকে ডিজিট করে তুলবো। আমাদের সংগ্রাম বৈদ্যুতিক সংগ্রাম! মাউথপিসে থুতু ঢুকে একটু ঘড়ঘড় করছে, তিনি বলে চলেছেন: একদিন হয়ত এইসব কাগজের বই আমরা তুলে দিতে সক্ষম হবো। এইসব পোকামাকড় আগুন লাগার আর কোনও ঝামেলা থাকবে না। শুধু ই বইয়ের মেলা। তারপর গলাটা একটু বিষাদগ্রস্ত। হয়তো আমি দেখবো না সেদিন, তবে আপনারা পারবেন বন্ধুগণ। আপনারা দেখবেন। সেদিন থেকে ঐ বিশেষ দিনটি বিভিন্ন বৈপ্লবিক অনুলোম মেনে জুলাই রেভোলিউশান ডে বলে পালিত হয় শহরের বিভিন্ন রাস্তায়।*

… তারপর যা বলছিলুম, ঐ ফোনকলটার প্রাপক সৌম্য শহরের মধ্যভাগে থাকে আর ফোনকারী থাকে দক্ষিণদিকের ল্যাজের মাঝখানে। ডাকে এ দূরত্ব পেরোতে সময় লাগে মোটামুটি ৭ দিন। এই ৭, ৭টা দিনে বাংলা অক্ষরের ব্যাধি, মানে অই ফোনকারী যা বলছে, মানে অক্ষরের হারিয়ে যাওয়ার রোগ, ছড়াতে পারতো মারাত্মক আকারে। ছড়িয়েছিলো। কিন্তু ৭টা দিন এবং ১০/১২ কিমি দূরত্ব শহরের মধ্যভাগে যতটা উচিত ছিলো তার থেকে কম প্রসারিত হয়েছিলো। যদিও সবার অলক্ষ্যে মালটা হাজির ছিলো শহরের প্রতি ইনচিতেই। অলক্ষ্যে, কারণ অই জানুয়ারি বিপ্লবের পর থেকে আমরা হাতে, মানে খাতায় কলমে আর কিছুই লিখি না! আর কম্পিউটারে বাংলা লেখা? *কেন কি উই ল্যাক নিডেড স্পেস হোয়াইল রাইটিং বেঙ্গলি* বলে উঠলো ১৬ বা ১৭-র কৈশোর। আর এমনিতে বাংলা ভাষার হাল? থাক না এখন! তার চেয়ে আমরা বরং অই ফোন প্রাপকের দিকে ফিরি। সে বিস্মিত। হতবাক। আহত। নিশ্চুপ। মারাত্মক চিন্তিত। কারণ সে যে শুধু তার বন্ধুকে ভালবাসে তা নয়। বন্ধু বাংলাভাষার একজন আখ্যান লেখক। বিরল জাতি। সে নিজে গভীর আখ্যান বিশেষ বোঝে না বলে একটু অপমানিতও বোধ করে। এতটা রসিকতা করবে? একটা টেকস্ট মেসেজ লেখে: yarki marchhis? tui ouponyasik hote paris kintu erom rosikataa bhaalo noy…

আমাদের লেখক নামক চরিত্রটির দিনের প্রথম কাজ হল মাটিতে রাখা ম্যাট্রেসের (বস্তুত সেটা ৩টে একক ম্যাট্রেসের দ্বিগুণ সমাস!) ওপরে উঠে বসা। তারপর সোজা ১টা হাত পা খেলানো। তারপর সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়া। এই জায়গাটা লক্ষ্য করার। প্রথমেই চোখ যায় বন্ধ রাখা পুব দিকের জোড়া জানলার গায়ে – ততক্ষণে ভেন্টিলেটার দিয়ে ঢোকা রোদ্দুরে রোদ হয়ে গেছে সকালের প্রথমকাঁপা ধুলোস্তম্ভ। ততক্ষণে এই ৩ তলার ২০ ফিট বাই ১৫ ফিট হলঘরটার সবকটা দেয়াল ঝাঁঝরা করে দিয়েছে পুব দিকের অই জোড়া জানলার তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া চওড়া রাস্তাটার বাহনসমূহ ; ঘুমটাকেও – সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে সাতটা, ঝাঁঝরা হওয়ার তীব্রতার ওপর নির্ভর করে এই ওঠা। এই জায়গাটা লক্ষ্য করার ওই তো ছেলেটা তার ম্যাট্রেস থেকে পা রাখলো মাটিতে এবং অবধারিত তার জন্মান্ধ চলা পশ্চিমদিকে। চানঘরে। এবং তারপরেই অবিশ্বাস্য দ্রুতি। তার আগে কয়েক সেকেন্ড স্থির। গিনি ও পালকের পরীক্ষা। সর্বোচ্চ অবস্থানের স্থিতি। তার পরেই স্যাট! তবে দ্রুতি এই ঘরটার দখল নেবার আগে আসুন আমরা একটু জরিপ করে নিই। আপনার সুবিধার্থে একটা নকশাই এঁকে দিলুম।

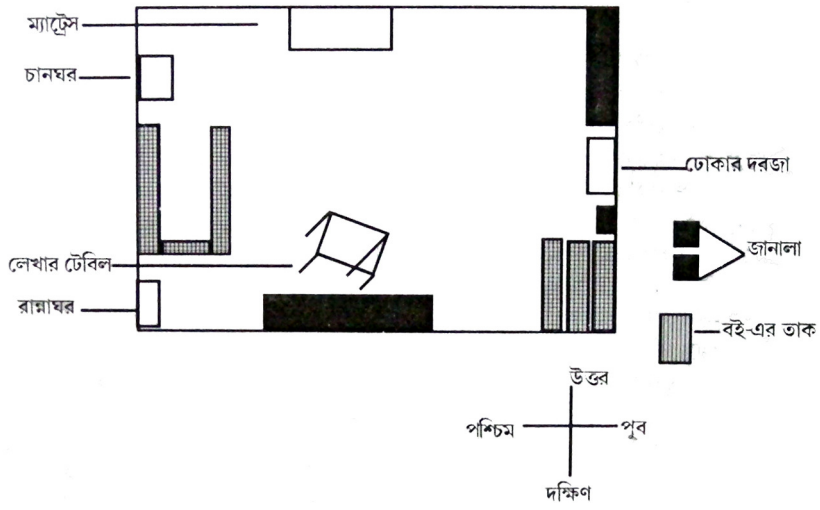


নকশার এই এক মুশকিল, সবকিছুকে একটা যুক্তিসিদ্ধ আকার দিয়ে দ্যায়। কিন্তু আদত ব্যাপারটা এত সহজ নয়। আপাত আয়তাকার এ ঘর কখনও বর্গাকার বৃত্ত, বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র, পরাবৃত্তাকার ত্রিভুজ, বৃত্তাকার অধিবৃত্ত আর প্রতিমুহূর্তে পাল্টে যাওয়া রং, তবে হলুদ আর গোলাপী মেশানো একটা রং প্রায় প্রতিদিন থাকে, আগেকার নেশাড়ু, নেশার্ত, যৌনকাতর সন্ধেগুলোতে যাবতীয় আহ্বান ছাড়িয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাকে এককথায় দুর্গা বলে ডাকা যাক। দুর্গা? এই ঘরের বাসিন্দা বলেছিলো যদি শৈশব শিল্পীর স্বর্ণখনি হয়, তাহলে, সেখানে আমাদের দুর্গাপুজোর একটা বড় প্রভাব আছে, সে খারাপ ভালো শূন্য আত্মরতি যাই হোক আছে, তাই এই পরিবেশের নাম দুর্গা। একটা স্থির ঝুলে থাকা পরিবেশ। শান্ত ফাতনা। আর এহেন অবস্থায় কেউ যেন নাইটক্লাবের ডি জের ঢঙে বলে উঠলো লুজ কন্ট্রোল! আর ওমনি ক্ষিপ্রতায় চা করেখেয়েহেগে জামাকাপড় পরে যখন কবি ফিটফাট নেমে পড়লো রাস্তায় তখন শহরের দক্ষিণভাগের এক প্রধান রাজপথে সকাল ৭টা থেকে ৭টা ১৫। আবার স্থিরতা। এটা কবির জীবিকার সময়। গৃহশিক্ষকতা। কোন দিকে যাবে তা নির্ভর করে দিনের ওপর। ৩ দিন শহরের মধ্যভাগে। ৩ দিন দক্ষিণ সংলগ্নে। কবির চলার, দাঁড়ানোর আঙ্গিকে কোথাও ১টা *অচেনা* শব্দটা আটকে আছে। এলিয়েন শব্দটা আরও প্রখর হবে। বাসস্টপে দাঁড়ানো। বাসের জন্য উদগ্রীব দশা। একটা প্রভাতি উত্তেজনা! যেন হঠাৎ করে ৬ এর দশকের গোড়ায় অতলান্তিক মহাসাগরের পেটে, কর্কটক্রান্তি রেখা বরাবর জড়ো হয়ে গেলো শয়ে শয়ে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ। প্রত্যুত্তরে সোভিয়েত ইউনিয়ানও পাঠিয়ে দিলো পারমাণবিক ক্ষেপনাস্ত্র সম্ভার: হাজারে হাজারে অ্যানিমিক ডাইনোসরের লিঙ্গের মত সাদা উত্থিত মিসাইল! মাঝখানে ছোট্ট দেশ কুবা। এই মারে এই মারে দশায় চলে গেলো বছর কয়েক। মার্কিন মুলুকের উত্তেজনাপ্রবণ জনগন ডাইউরেটিক ট্যাবলেট খেয়ে মুতে ভাসালেন! অতলান্তিকের জল কি একটু নোনতা হয়েছে তারপর থেকে?

জলের খবর জাহাজই বলতে পারে। মাঝখান থেকে ছোট দ্বীপরাষ্ট্র কুবা উঠে এলো মানচিত্রে। এ পুরো আলো ক্রমে আসিতেছে দশা। সে দেশের বিপ্লবী রাষ্ট্রপতি নানা দেশে বিপ্লব রফতানি করিতে করিতে প্রখর খ্যাত আর সেই খ্যাতিতে মার্কিন রাষ্ট্রযন্ত্রের অণ্ডকোষ কিশমিশ। আহ, তখনই সে মহান নেতার পুঁটকি পাট হইয়া গেলো। ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি সম্রাট মহারাজাধীরাজের বান্ধবী নাকি রাঁড় নাকি চিন্তাসঙ্গিনী এই ধাঁধা যখন দেয়ালে ড্যাম্পের মত ব্যাপিত হইতেছিলো সেলিয়া সানচেস নাম্নী নারীর পোস্টার ঘিরে ঠিক তখনই মহিলার মৃত্যু হয়। হায় সিয়েরা মায়েস্ত্রার প্রথম মহিলা গেরিলা! তারপর থেকে ব্যক্তির বিষাদ আপাদমস্তক ঘিরে ফেলল ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্রকে আর? আর কী? হাজারে হাজারে লোক ছেঁড়াফাটা নৌকায় চলতে শুরু করলো মার্কিন মুলুকে। এরকম তো সবসময়ই যায়। এক দেশ থেকে আরেক দেশে কত লোক, কত খুচরো মানুষ: এই তো যেমন আমাদের ঔপন্যাসিক চরিত্রটি। তার কৈশোরে তার মামা ভারতবর্ষ হিন্দুদের সেফ কাস্টডি ভাবিয়া উহাকে রফতানি করিয়া দিলেন আরেক দূরতুতো মামার কাছে। তার অনেক আগে মুক্তিযুদ্ধেই মুক্তি পেয়েছিলেন লেখকের বাবা মা। আর সে নিজে? এসো মুক্ত করো মুক্ত করো স্টাইলে সে রক্ত রক্তের সম্পর্ক সংক্রান্ত যাবতীয় জালিগিরি প্রতিভাসুলভ স্বভাবে ধরতে পেরে গিয়ে যোনিগ্রহন সেরে ফেলেছে মামার শ্যালিকার সঙ্গে! তারপর এপারে পৌঁছে সে এমন একটা জায়গায় পড়লো যে বরিশাল জেলা থেকে আগমণ সত্তেও , কিছুতেই 'ঢাকি' অর্থাৎ 'ঢাকা থেকে আসা' নামটা তুলে ফেলতে পারলো না। এ জায়গাটা দ্যাখার, বাস এসে গেছে, উঠে পড়বে লেখক। পুরুষ লেখক ভাবলেই আমাদের মাথায় যে নেতানো, ঠাণ্ডা বেগুনীর মত উরু ও বাহুযুক্ত পুরুষের স্নায়বিক চেহারা তৈরি হয়, এ বেটা তেমন নয়। উচ্চতা মোটামুটি ৬ ফিট। গায়ের রং বেশ কালো – প্রায় দুধে আলকাতরায় বলা যায়, চুল কোঁকড়ানো, তার ওপর সকালের রোদ যখন এক্‌ঝলক ধুলো সমেত চমকে উঠলো তার কালো ম্যাট ফিনিশের চশমার ফ্রেমে তখন সে তরতাজা! এই ঘুমন্ত এবং ঘুম ভাঙার বাসগুলো সকালের দিকটাতেই একটু বেশি চাঙ্গা থাকে। চারপাশ খটখটে থাকলেও মাথার ভেতরে ১টা 'ভিজে' শব্দটা আটকে থাকে। বাসে উঠে প্রথমে এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে, বসতে পেলো কি পেলো না সেটা বড় কথা নয়, সে নিজের গালে হাত বোলায়। এমনিতে গোঁফ দাড়ি পরিস্কার করে কামানো। বন্ধুরা কবির ভেতরে কভ্রমউনিস্ট ভাব মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়ায় তাকে ক্লিনশেভিক বলে ডাকে! লেখক হাত বোলায় আর ভিজে ভাবটা প্রত্যক্ষ করে। মাথার মধ্যে ২০ মিনিটব্যাপি বাবলগাম চিবোনো দশার পর এসে যায় প্রথম পড়াতে যাওয়ার বাড়ি। মধ্য বা দক্ষিণ সংলগ্নতা যাই হোক মোট দুটো খেপ থাকে সকালে। সে ফেরত আসে বেলা ১টা নাগাদ। তারপর নিজেরই ফোটানো/রান্না করা খাবার খেয়ে ১টা তন্দ্রা। এরপর দিনের ভেদরেখা অতিক্রম করে, অর্থাৎ সপ্তাহের প্রতিদিন সে বিকেল ৪টে নাগাদ বেরোয় 'ফেল করে হতাশ?' কোচিং সেন্টারে পড়াতে। এটা বাড়িটার কাছে। শেষ করে ৭টা নাগাদ যখন সে অই নকশার ঘরে ঢোকে, ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে সৌম্য। তার কাছে ১ সেট চাবি থাকে। অর্থাৎ ঠেক শুরু। এরপর সাড়ে ৮টা কি ৯টার সময় আসবে ফ্যাকলা (ঋতুর ওপর নির্ভরশীল) । এবং আপনি এই অ্যাকটিভিটি বা সক্রিয়তা - হীন অধ্যায় পড়তে পড়তে বিরক্ত পাঠক, নিশ্চয় ধরে ফেলেছেন ওই বাস টাস ধরার কারু এবং কার্য সবটাই লেখক নামক চরিত্রটার চেহারা ও পরিপার্শ্বের বর্ণনা দেওয়ার একটা ছক! এবং যুক্তি যখন এসেই গেলো তখন আপনি আরও নানাবিধ যুক্তিতে সিদ্ধ করা প্রশ্নবাণে আমাকে বিঁধে ফেলবেন এবার। বরং সেই সুযোগটাই আমি নিই, তাতে যদি একটু সক্রিয় হওয়া যায়।

প্রশ্ন: লেখক মালটা শুধু টিউশানি করে, তারওপর প্রথম প্রজন্মের রেফিউজি, তার দক্ষিণ কলকাতায় পেল্লায় একটা ফ্ল্যাট, মামার বাড়ি?

উত্তর: ও বাড়ি লেখক নামক চরিত্রটির নিজের তো নয়ই, এমন কি সে ভাড়াও থাকে না। সৌম্য তাকে থাকতে দিয়েছে। সৌম্যদের পৈতৃক জমিতে যখন শহরের প্রথম প্রজন্মের প্রমোটারকূলের একজন, তখন হেমন্ত মুখার্জি রেকর্ড করছেন *তোমার ও মন মহুয়া যদি হয়* গোছের গান। পরে ওই উক্ত ঘরখানি সৌম্যর বাবার বেলেল্লাগৃহে পরিণত, তখন সেই একই শিল্পী রেকর্ড করছেন *চাঁদ কহে চামেলি গো* । ভদ্রলোক মারা যান অকালে। যে রমণীকে তিনি আমার সকল রসের ধারা তোমাতেই হোক না

হারা স্টাইলে জাপটে ধরেছিলেন তাঁর কোলে এবং উক্ত ঘরটাতেই। এখন আপনি বলবেন এ দেশে আবহমান কাল থেকে ফকিরেরা বলে আসছে অকাল বলে কিছু হয় না পাগলা। যে যার নিজের কালেই যায়। আর সেই একই বিশ্বাস সৌম্যদের এন্টালির আদি বাড়ি থেকে ৮টা দেয়াল দূরের রকের লোকজনের। সৌম্য তখন নিতান্তই মায়ের কোলে বলে জানতে পারেনি সেই রকারদের কথা: *বিচি ফেটে ঠিক টাইমেই মরেচে!* যে কোনও পুরনো হিন্দু বাড়ির অদ্ভুত ধুনোগন্ধী পরিবেশের পুরোহিতের মত এবাড়ির পুরোহিতও ওই দক্ষিণের বাড়িটাকে ছেড়ে রাখতে বলেন। রাখাও হয় দীর্ঘদিন। পরে সৌম্যর সঙ্গে অই লেখক অর্থাৎ অরিন্দমের আলাপ হওয়ার পর গুষ্টির চব্বো ঝেড়ে ফেলে তাকে থাকতে দ্যায়। ততদিনে অবশ্য গুষ্টি প্রায় শেষ। তবে এটা একটা যৌথ অবস্থানের মত। এদের দলের যেকেউ এসে থাকতে পারে।

৩

সকাল থেকেই মেজাজটা বিগড়ে ছিলো সৌম্যর। তারওপার দুপুরে আসা ফোনটা আরও রেমন যেন তেতো করে দিলো জিভ। *এত বাড়িয়ে ভাবে না ছেলেটা!* ৭/৮ দিন ঠেকে যেতে পারেনি কাজের চাপে। আজ ঠিক করেই রেখেছিলো যাবে। অফিসের অর্থাৎ তার নিজের ছোট্ট কলসেন্টারের নতুন সহকর্মী বন্ধু ক্লাউদিয়াকেও নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু ফোনটা ... প্রথমে ভেবেছিলো লেখকসুলভ রসিকতা। মাঝে মাঝে নতুন কিছু লেখার মহড়া দেবার সময় এরকমই করে থাকে অরিন্দম। কিন্তু গলার স্বরে সে টান ছিলো না। টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েও অস্বস্তিটা যাচ্ছিলো না। সৌম্য জানে অরিন্দম উত্তর দেবে না। সৌম্য হাঁক পাড়ে

– তনুদি জল বসাও, বেরোব
– বড়মারটা তৈরি আচে।

ছোট্ট সংলাপের ফাঁকে সৌম্য জানলার বাইরে দিয়ে চোখ পাঠায়। ধোঁয়াশায় পশ্চিমদিকের জোড়া গির্জা ম্লান। আকাশটা স্লেট রঙের। তার ওপর দিয়ে চক বোলাচ্ছে কিছু সাদা পোষা পায়রা।

স্নান খাওয়া সেরে যখন সৌম্য নামতে যাচ্ছে তখন রোজকার মত তপুদির বড় মা অর্থাৎ সৌম্যর মায়ের নিথর দেহটার দিকে চোখ ফেরায় সৌম্যর শরীর। তার বাবার বহুগামীতা ধরা পড়ার ৭ দিন পর থ্রম্বোসিস। তারও ১০ বছর পর মাথায় রক্তক্ষরণ। গত ৪ বছর একদলা হাড়মাংস। একটা প্যাসেজ সোজা গিয়ে ঢোকে বসার ঘরে। সেই বিরাট লম্বাটে বসার ঘরের দুটো মাথায় দুটো দরজা। সেখান দিয়ে বেরোনো ২টো ঘরে। একটা সৌম্যর। একটা ওর মায়ের। তপুদি থাকে মায়ের ঘরে। প্যাসেজে পড়লে ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজার প্রায় মুখোমুখি একটা ঘর। ফাঁকা। এটা বাবার হতে পারতো। সেটাকে পাত্তা না দিয়ে সোজা হেঁটে গেলে এবাড়ির রান্না ও ভাঁড়ার ঘর। গোটা বাড়িটাতেই একটা সমুদ্রসবুজ রঙের নৈশ:ব্দ্য আছে। এই বাড়িটা যাকে সৌম্য ছোটবেলাতেও দেখেছে বাড়ি হিসেবে, সেটা আজ একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে পরিণত। কাকা জ্যাঠারা বেশিরভাগই বিদেশে। ২জন পড়ে আছে। গরীব রেসার্ত ছোট কাকা আর তারা। বড় জ্যাঠার ছেলে গত বছর ইয়র্কশায়ারে বিরাট একটা জমি কিনেছে। কিন্তু সৌম্যর সে জিনিস ধাতে নেই। আপাতত নিজের তৈরি করা খুবই ছোট্ট একটা ১০ জন কলারের কল সেন্টার চালায়। কাজ ফ্লোরিডায় পিৎসা বেচা। এই ফ্ল্যাটবাড়িটার সবচেয়ে উঁচু তলা অর্থাৎ ৮ তলায় থাকে তারা। মানে তার মায়ের সমবয়সী তপুদিকে নিয়ে ৩ জন। গোটা ফ্ল্যাট বিক্রির টাকা ভাগ হয়ে গেছে আইন মেনে। কেউই বাধা দেয়নি। অদ্ভুত বিরলতায়।

সাড়ে ৩টে নাগাদ যখন সৌম্য রাস্তায় নামল, তখনও আকাশ স্লেট। যদিও একপশলা বৃষ্টির পর নিঃশ্বাস একটু তাজা। বাড়ি থেকে নামলে এন্টালি সি আই টি রোডের ফিলিপস বাসস্টপ। রাস্তাটার মাঝখানে এই সেদিন অব্দি কত গাছ ছিলো। এখন বৃষ্টিহীন দিনগুলোয় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। গাছ কেটে রাস্তা চওড়া করা হয়েছে। নেমেই মাথাটা আপনা থেকে বাসস্টপে আটকানো হোর্ডিংটার দিকে যায়। রোজকার অভ্যাস। কিন্তু অদ্ভুতভাবে আজ বাংলায় লেখা লাইনটা থেকে ৩টে অক্ষর মুছে গেছে। গতকাল রাতেও ছিলো ***পাড়া পড়শির ঘুম নেই*** আজ ***ড়া প শির ম নেই*** হঠাৎ একটা উৎকণ্ঠা গলা দিয়ে দলা পাকিয়ে নেমে গেলো। মনে হচ্ছে কেউ বুঝি মুছে দিয়ে গেছে ইচ্ছে করে যাতে নজরে পড়ে। সৌম্যদের বাড়িতে একমাত্র সৌম্যই গাড়ি চালায় না। রেসার্ত কাকারও একটা গাড়ি আছে। তার নেই। ট্যাক্সিতে চড়া তার এক শখ। বাড়ির ঠিক তলায় কিছু ট্যাক্সি এমনিই দাঁড়ায়। প্রায় পোষা কুকুরের মত কোনও কোনও ট্যাক্সি এগিয়েও আসে। আজও এলো। দক্ষিণমুখো রাস্তায় যেতে যেতে উত্তেজনা আরও বেড়ে যাচ্ছে। একঝাঁক ইংরেজি হোর্ডিঙের মাঝখানে সংখ্যালঘু বাংলাগুলোর প্রত্যেকটার অক্ষর খসে গেছে। ডন বসকোর চাকতি ঘুরে পার্ক সার্কাস ময়দানের গায়ে একটা বড় হোর্ডিঙের বাংলা অক্ষরগুলো ফুলে উঠেছে জল ফোসকার মত। সিগন্যালে আটকে থাকা ট্যাক্সিটার মধ্যে সে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসার চেষ্টা করে। চোখ বাইরে গেলেই একই দৃশ্য। বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসের সামনে নেমে পড়ে সৌম্য। পাশে জানুয়ারি বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপন চলছে। সানি পার্কে থাকে ক্লাউদিয়া। সৌম্যরই এক

জ্যাঠার ফ্ল্যাট। তারা দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাদের পেল্লায় ফ্যাটটা কম পয়সায় ভাড়া নিয়েছে সে কল সেন্টারের স্টাফ কোয়ার্টার হিসেবে কাজে লাগায়। সেই সুদূর এল সালবাদোর থেকে এসেছে ক্লাউদিয়া।

**৪**

নদীর পাথুরে পাড়ে পা যতখানি শিথিল করা যায়, তার চেয়ে সামান্য কম ছাড়িয়ে ১টা পাথরেরই ওপরে বসে আছে ক্লাউদিয়া। সাধারণ কালো স্কার্ট আর গোলাপী জামা পরে। এ জায়গাটা ভীষণভাবে লক্ষ্যণীয়, ক্লাউদিয়া তো কোন ছার, তার বাপ পিতেমোরাও মধ্যআমেরিকার এই দেশটাকে দেখতে পাননি, এমন কি তাঁদের পিতেমোরা হয়ত সবে ভাবছেন বংশবিস্তারের কথা, তখন এই অঞ্চলে বাস করত পিপিল সাম্রাজ্যের মানুষেরা। তাঁদের ছিলো উপাচার **কিনা**। এটি পুরুষতন্ত্রের ভ্রূণ। না না উপাচারে চন্দ্রবাসী এক দেবিকে সন্তুষ্ট করে চলতো পুরুষদের এগিয়ে যাওয়ার সাধনা। এই উপাচারে পুরুষরা আসতেন নানা মুখোশ পরে। সে সময় গানটানও ছিলো। লিপিগুলোকে সাহেবরা হায়ারোগ্লিফিক বলে দূর করে দিয়েছে। কিছু কিছু গানের স্মৃতি হয়ত আজও পড়ে আছে গ্রামের ভেতরে, আরও আরও আরও গভীরে।

আর এখানেই এসে পড়ে ক্লাউদিয়া। কখনও চওড়া রাস্তা আবেনিদা বেনেসুয়েলা, কখনও বা সরু কোনও রাস্তা এসে পড়ে নদী আসেলুআতের তীরে। তীর বলতে যা বোঝে আমাদের মাথা, বা নদী বলতে কোনও ধারণার সঙ্গেই মিলবে না। সরু, পাথুরে, প্রতিতুলনা দিতে পারে আমাদের দেশের কোনও পাহাড়ী নদী। খরস্রোতা। তবে এ নদী ভয়ংকরভাবে দূষিত। নদী টপকালেই শুরু হয়ে যায় উঁচু নীচু এলাকা। কোথাও ৮০০মিটার কোথাও বা ১২০০ মিটার। তবে মূল শহরটা প্রায় সমতল। এখানেই বসে পড়ে ক্লাউদিয়া। দিনটা ধূসর। পরিপার্শ্ব যখন পেপার ওয়েটের মধ্যে বন্দি গাছগুলোর মত স্পর্শের অতীত বলে মনে হচ্ছে, অন্তত পাথরের ওপর ক্লাউদিয়ার হাতের ত্রস্ত নড়াচড়া তার প্রমাণ দিচ্ছে, হঠাৎই বাঁ কাঁধে আলতো আঙুলের চাপ পড়ায় গড়িয়ে যায় পেপার ওয়েট। চকিতে গালে বসে পড়া সম্ভাষণী চুম্বন তাকে প্রস্তুত করে দ্যায় কথোপকথনের জন্য। সামনের নদী বা আকাশ আরেকটু ধূসর হয়েছে বুঝিবা। রাউল। সময়টা বিকেল। ক্লাউদিয়া অপেক্ষা করছিলো রাউলেরই জন্য। চুম্বন থেকে ঠোঁট সরতেই নড়ে ওঠে রাউলের জিভ। একটু দ্রুতই বলে চলে সে, প্রচণ্ড উত্তেজনায় রাখা খবর যেভাবে বলে মানুষ।

- ভিসা হয়ে গেছে ।
- আমার ভয় করছে এবার। ক্লাউদিয়া বলে চলে: ভারত একটা পেল্লায় দেশ। শুনেছি বেশির ভাগ লোক ইংরেজি জানে না।
- অত ভাবতে হবে না। তুমিই বা কি এমন ইংরেজি জানো? শুধু মনে রেখো দেশটাকে আমাদের চিনতেই হবে। আর মাত্রতো ১টা বছর। তারপর আমিও চলে যাবো। এই সময়টার অ্যাডভেনচারটার কথা ভাবো একবার।
- অ্যাডভেনচার গুলি মারো! তুমি ভাবো আমি একা, ১টা মেয়ে সম্পূর্ণ অচেনা ১ টা শহরে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ১টা দেশে আস্ত ১টা বছর কাটাবো কী করে?
- কিন্তু কী করতে চাও? এত কষ্ট করে ভিসা পাওয়া গেলো! তুমি কি এদেশে পচতে চাও? তুমি নিজেই জানো এর উত্তর জানো। বেশ রেগে বলে উঠলো রাউল।
- দেশ ছাড়ার অর্থ কী সেটা বুঝতে পারছো?
- দেশে থাকার অর্থটা কী সেটা বুঝতে পারছো? মার্কিনরা আমাদের সহজে ঢুকতে দেবে না। এই অবস্থায় ভারত না হয় চিন কোথাও একটা মাথা গলাতে হবেই। এইসব দেশে অনেক লোক থাকে সহজে নজর পড়বে না।
- চিনেও পারবে না?
- শুধু ভারতে পারবে না।
- সে তো নয় আমাকে পারবে না। নিজের দিকে দেখেছো একবার?

হঠাৎই নিজের দিকে তাকায় রাউল। সে এল সালবাদোরের বিরল শ্বেতাঙ্গদের একজন। কোঁকড়ানো গাঢ় চকলেট রঙের চুল। খয়েরি চোখের মণি। গাল মসৃণভাবে কামানো। প্রথম দর্শনেই তাকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ বলে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। এই রং নিয়ে এখানে রোজ মারামারি। এই একই কারণে ক্লাউদিয়া আর রাউল একসঙ্গে থাকতে পারেনা এই উন্মুক্ত যৌনতার দেশে।

- দ্যাখো, কলকাতা আপাদমস্তক একটা আধুনিক শহর, ওখানে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। তুমি শুধু পোশাকের দিকে একটু নজর রেখো
- মানে?
- মানে খুব খোলামেলা পোশাক পরতে বারন করেছে পাবলো।
- কিন্তু একটু বোঝার চেষ্টা করো, কী মারাত্মক একা থাকতে হবে আমাকে

পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মত এখানেও দ্বন্দ্বটা থেকে যায়। সাদা বা কালো কোনও বাস্তবই নয়, বরং একটা জটিল অর্থবহ বিমানযাত্রায় ক্লাউদিয়া বা বন্ধুদের ক্লাউ এসে পৌঁছে যায় কলকাতায়। পাবলো। একজন কলম্বিয়ার নাগরিক। দীর্ঘদিন কলকাতায় আছে মা তেরেসার নামে। সে চেনে যাবতীয় অন্ধিসন্ধি কলকাতার। সেও কিছুতেই ফিরে যাবে না। এক আশ্চর্য আপতনে পাবলোর মারফত ক্লাউ এর মত আরও অনেকেই এসেছে কলকাতায়। থেকে গেছে। ক্লাউ এসেছে আপাতত বাংলা শেখার অছিলায়। ঢুকেও পড়েছে ভাষাশিক্ষা বিদ্যালয়ে। এল সালবাদোরের যাবতীয় সম্পত্তি সে বিক্রি করে দিয়ে এসেছিলো আগেই, সামান্য হলেও সেই অর্থ, যেখানে সে বাংলা শেখে সেখানে আংশিক সময়ের এস্পানিওল ভাষার শিক্ষিকা আর রাউলের পাঠানো অর্থে সচ্ছলভাবেই কেটে যাচ্ছিলো দিন। মাস। প্রায় ১ বছর। এখন সে মোটামুটি ট কে ত বলে বাংলা সরল বাক্য বলতে পারে। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ টাকা আসা বন্ধ হওয়ায় একটু চিন্তিত হয়ে রাউলকে ফোন করলে উত্তর পাওয়া যায় না। বারবার ফোন। বারবার উত্তরহীন। এই অবস্থায় সেই পাবলোর সঙ্গে বসে ইন্টারনেটে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দ্যাখা যায়, রাউলদের বিখ্যাত কোসার পরিবারকে পুলিশ ধরেছে খামারে নারকোটিক চাষ করার দায়ে! মানে রাউল আর ফিরবে না। কোনও শ্বেতাঙ্গকে একবার জেলে পুরে ফেলতে পারলে এইসব দেশে আর কোনও ছাড় নেই। এতখানি বৈষম্য যে সাধারণ সুযোগ পেলেই প্রতিশোধস্পৃহা ঝলসে ওঠে মাথায়। প্রায় আত্মহত্যা করতে বসা ক্লাউকে পাবলো প্রথমে মা তেরেসা পরে সেখান থেকেই কী যেন একটা সূত্রে একটা কল সেন্টার, সেখান থেকে বর্তমান কর্মস্থল। বা সৌম্যর দা কমিউনিকেটার। গত ২ বছর ধরে এই হল ক্লাউদিয়া বিলোরিও দে লা বাররেরা এর বিবর্তন।

**৫**

সকাল থেকে মোবাইলে টেক্সট মেসেজ ছাড়া আর কিছু লিখে উঠতে পারেনি অরিন্দম। যতবারই লিখতে চেষ্টা করেছে ততবারই অক্ষরগুলো গুঁড়ো হয়ে পড়ে গেছে। পড়ানোর ফাঁকে চেষ্টা করেছিলো কোচিং এর সাদা বোর্ডে মার্কার কলম দিয়ে কিছু লিখতে, কিন্তু তাও খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ঝরে গেছে।

আর এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে বিস্মিত অরিন্দম ফোন করেছিলো সৌম্যকে। যদিও সৌম্য ভাষা সাহিত্যের লোক নয়, কিন্তু অরিন্দমের বিশ্বাস তার সঙ্গে কথা বললে খানিকটা কাটবে এই দমবন্ধ অবস্থা। এই শীতলতা। আজ জোসেফেরও আসার কথা। তার কাছেও কিছু জানা যাবে। ইত্যাদি সাত পাঁচ ভাবনার মধ্যে যখন চোখে পালক বোলাচ্ছে ঘুম তখনই দরোজার শৌখিন হাতঘন্টিতে টোকা পড়লো। ৫ ফুট ৮ ইনচি এর ফরসা চশমা শোভিত সাদা হাফ জামা আর নীল জিনস, অ্যাথলিট চেহারার সৌম্য তার হর্সটেইল চুলে রাবার ব্যান্ড লাগাচ্ছিলো। আজ টানটান করে চুল বাঁধা। দাড়িটা একেবারে ১৯ শতকী আজ! সঙ্গে একটা নাক চ্যাপ্টা নেপালী নেপালী চেহারার মেয়ে। মৃদু তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন অরিন্দম একটু ঘুমমনস্ক ছিলো। সেই অবস্থায় ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সৌম্য প্রশ্নটা প্রায় ছুঁড়ে মারলো

- কবে প্রথম দেখলি বলতো?
- কী?
- আরে! তুই বাংলায় লিখতে পারছিস না সেটা।
- ওহ। আজই। তবে ভাবতে গিয়ে দেখছি একটু একটু লক্ষণ নজরে পড়ছিলো কয়েক মাস ধরেই। তুই কিছু দেখেছিস?
- না। তবে আজ দেখলুম।
- কী দেখলি?
- বেশ কিছু সাইনবোর্ডের বাংলা অক্ষর কেমন যেন ফুলে উঠেছে। ঝরেও গেছে কয়েক জায়গায়।
- কাল সন্ধেবেলা পূর্ণদাস রোডে ঢোকার মুখের হোর্ডিংটার সব বাংলা অক্ষর খসে গেছে।

এইসব কথাবার্তার মাঝখানে এরা ৩ জন এসে বসে পড়েছে সেই পরিচিত ম্যাট্রেসে। কিন্তু কথা/ঘটনার আকস্মিকতায় ২ জন পুরুষ ১ জন নারীর উপস্থিতির কথা একেবারে বিস্মৃত হয়েছে। আবার কথা বলে অরিন্দম ব্যঙ্গের মত:

- এটা রাজবাড়ির ছক নয়তো? – এরা বন্ধুদের মধ্যে শাসক দলের প্রধান কার্যলয়কে রাজবাড়ি বলে।
- ওরা কি করে করবে?
- কে জানে কোনও পাউডার ফাউডার তৈরি করেছে কোনও পেটোয়া ল্যাবে।
- দূর! এরকম হয় নাকি?
- দ্যাখ যাবতীয় বিরোধীদের মেরে ফেলা এদের ঐতিহ্য দুনিয়া জুড়ে তা তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই।
- তার সঙ্গে অক্ষরের কী সম্পর্ক?

– এখন গোটা বাংলাভাষাটাই ওদের বিরোধী হয়ে উঠেছে। জানিস একবার মেদিনীপুরে একটা মাঠে আমি জমাট কুয়াশা দেখেছিলুম মে মাসে। স্থানীয় লোকেদের প্রশ্ন করে জানতে পারি ওই মাঠে নাকি রাজবাহিনী ১০ জনকে পুঁতে দিয়েছিলো সেই ৮ এর দশকে। তারপর থেকেই কুয়াশা থাকে।
– যত্তসব আজগুবি জিনিস!
– কতদিন আর যুক্তির দাসত্ব করবি?
– আসল কথায় আয় এখানে এটা কী হচ্ছে?
– জোসেফ বলছিলো বারুইপুর ইত্যাদি যেখানেই জমি নিতে গেছে রাজবাহিনী সেখানেই কুয়াশা হচ্ছে।
– আবার বাজে কথা
– না রে বাজে কথা নয়। এর সঙ্গে যোগ আছে এই অক্ষরলুপ্তির।
– মানে?
– আমাদের মত সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের ভাষা আজও বাংলা। আর সেটা ওদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। ওরা ছেড়ে দেবে?

হঠাৎই অরিন্দমের কথার মাঝখানে ঢুকে পড়ে নাক চ্যাপ্টা মেয়েটা। ভাঙা বাংলায় বলে – কী হয়েছে একটু বুঝিয়ে বলবেন?
অরিন্দম সোজা বিস্মিত তাকায় মেয়েটার দিকে। সাড়ে ৫ ফিট মত উচ্চতা। গায়ের রংটা সামান্য একটু হলুদ হলেই *নি হাউ* বেরিয়ে আসত মুখ থেকে। স্তনের গঠন সুঠাম। একটা বেগুনী টি শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা মোটের ওপর সাধারণ উপস্থিতি। অরিন্দমের বিস্ময়ের উত্তর দিয়ে সৌম্য খুব সংক্ষেপে ক্লাউদিয়ার পরিচয় সারায় ইতিহাস ভূগোল সমেত, এবং জুড়ে দ্যায় অরিন্দমের পরিচয়ও। যদিও বেশিরভগ কথাই সে আসার পথে জানিয়ে রেখেছিলো। এরপর ২ জনে মিলে এই বিদেশিকে বোঝাতে শুরু করে ঘটনার গুরুত্ব। উত্তেজিত অরিন্দম জানায় যে হাতে, মানে খাতায় কলমে বাংলায় কিছু লেখা যাচ্ছে না। লিখলেও তা শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর ঝরে গিয়ে পাতাটা বিলকুল সাদা। এরই মধ্যে আরও দ্যাখা যাচ্ছে যে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড গ্লোসাইন থেকেও অক্ষর খসে পড়ে যাচ্ছে। গোটা ব্যাপারটা যখন বোধের মধ্যে, ঠিক তখন, যখন, আগে চেনা জোড়া জানলার বাইরের গাছটা সন্ধে হয়ে গেছে, আবার ঘন্টা। বাইরের সন্ধে সাড়ে ৬টায় জোসেফের ভীষণ অবাক করা উপস্থিতি। স্বাভাবিক চটি খোলা জোসেফকে চুপচাপগুলোর মধ্যেই অরিন্দম প্রশ্ন করে

– কাল যা দেখতে বলেছিলুম দেখেছিলি?
– দেখেছিলুম কিন্তু বুঝিনি তেমন কিছু।
– কাল সন্ধেবেলা পূর্ণদাস রোডে ঢোকার মুখের হোর্ডিংটার সব বাংলা অক্ষর খসে গেছে।
– কিন্তু তুই আমাকে এইসব দেখতে বলিসনি। বলেছিলি আমার চারপাশে কেউ বাংলা বই পড়ছে কি না সেটা দেখতে। দিব্বি পড়ছে!

এবার জোসেফের চোখ পড়েছে নারী উপস্থিতির দিকে। আপাত রুক্ষ চেহারার বিস্মিত চোখের বিস্ফার দেখিয়া সৌম্যই পুনরায় দায় তুলে নিলো পরিচয় করানোর। ক্লাউদিয়ার পরিচয়ে যেমন জোসেফ তেমনি জোসেফের চেহারা ও পোশাকে পুলকিত ক্লাউ। সেটা নজর এড়ায় না। সৌম্যর। সে বলে ও আমারই মত ইশকুলে উইন্ডো সিটার ছিলো।

– মানে?
– মানে ওই ইশকুলে যারা ব্যাকবেনচারদের চেয়েও পেছনে বসে, তার বসতে পায় জানলায়, আমরা তাদের উইন্ডোসিটার বলি

**৬**

এই রাত ১১টা ৪০ নাগাদ, অন্তত আজ জোসেফের মেজাজ সুফিয়া। কারণ দক্ষিণগামী ৪৭ এ নম্বরের বাসটা চড়ার আগেই, তার কালো লম্বা দাড়িহীন গোঁফ সমেত উপস্থিতি ছিলো ল্যান্ডস্‌ডাউন অঞ্চলের এক বিয়ে বাড়িতে। বাড়িটার সারা শরীরে উচ্ছাস। এলাকার প্রায় সমস্ত বাড়িই সুঠাম, তার ওপর উৎসব ছড়িয়ে পড়ায় আরও তীক্ষ্ণভাবে অভিজাত। আর মেয়েগুলো? ও যতবার কালো প্যান্টটার পকেটে হাত ঢুকিয়েছে আজ, রুমাল বা অন্য কোনও অছিলায়, প্রচণ্ড মোটা শক্ত পাইপের উত্তাপ লেগে গেছে আঙুলে। আর হবে নাই বা কেন? আজ অনেকদিন পর, অনেক অনেক দিন পর গোলপার্ক মোড়ের রোলের কারিগর ফ্যাকলার ডাক পড়েছিলো আইসক্রিম কাটার জন্য। এইসব দিনেই ফ্যাকলা জোসেফ হয়ে ওঠে। আর মেয়েগুলো? কী মসৃণ, উজ্জ্বল! দেখতে দেখতে আইসক্রিম কাটার ছুরি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিলো। আর কী তাদের ঢং! ইংরেজি ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছুই বেরোচ্ছিলো না। ফ্যাকলা শুধু আইসক্রিম শব্দটাকে শুনছিলো আর টানটান হয়ে উঠছিলো ব্যুফে কাউন্টারের পেছনে। যেন পারলে ছুরি দিয়ে বশীকরণ মন্ত্র পুরে দ্যায়। আইসক্রিমের ভেতর। কিন্তু অই! মেয়েদের গলা দিয়ে আইসক্রিম বেরোচ্ছে কোথায়?

কেন খাচ্ছে না ওরা? মালিকের কি কিছু ভুল ছিলো? পাশ থেকে নিতাই বলে উঠলো দেখিস এ মাগিদের লোম তোলাতে আর পার্লারে যেতি হবিনি। না খেয়ে খেয়ে ঘেয়ো কুকুরের মত এমনিই ঝরি যাবে! হাসি পেলেও রসিকতাটা ভালো লাগেনি ফ্যাকলার। রোজকার ফ্যাকলা সন্ধে থেকে একটা বা আধখানা জোসেফসন্ধে বের করে আনা যে কী কঠিন! এমনিতে এসব বাড়িতে আর কেউ ডাকে না। যা হয় সব বড় বড় হোটেল আর কেটারিংএর হয়। অনেকদিন বাদে তার দোকানের পাশের চপ ভাজার ছেলেটা জুটিয়ে দিয়েছে এই কাজ। কিন্তু মেয়েগুলো নিচ্ছে না কেন? ৪৭ এ বাসের প্রবল হলুদ আলোয় তখন সামনে কন্ডাকটার। তোবড়ানো হাতটা বাড়িয়েছেঃ কী রে আজ কাটা ছিলো? কন্ডাকটার পরিচিত। ফ্যাকলার এলাকায় আরেকটা বস্তিতে থাকে। ন্যাতানো মাতলামির ম্লানিমা আর জনশূন্যতায় প্রকট হয়ে ওঠা ততোধিক ম্লান ধূসর ভিজে ভিজে সিটের ধাক্কায় অভিঘাতে বেশ রাগ হয় ফ্যাকলার। একটু একটু করে গলে যাচ্ছে জোসেফ। সামনে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম ক্রসিংএর সিগন্যাল তখন দপদপে হলুদ। তোরা বাসটাকে সাজাস না কেন রে? কন্ডাকটারের হাত ততক্ষণে ফিরে গেছে স্বস্থানে– লেডিজ সিটে। মালকড়ি ভালো? আবার ময়লা দাঁতের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসে কন্ডাকটারের। উত্তর দ্যায় না ফ্যাকলা। হলুদে হলুদে ধূসরে ভেজায় দাঁতের ময়লায়, গায়ের গন্ধে তার রাগ আরও বাড়তে থাকে। ব্যাটা নিতাই বলে রিনা উত্তাল বলে এক মাড়ুর বাড়িতে না কি আরও ফর্সা, আরও নির্লোম সব মেয়েরা এসেছিলো। রাগ চাপতে চাপতে ২ টো চোখের লাল টকটকে শিরাগুলোর পাশ দিয়ে ডানদিকে তাকালে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাসাদটা জ্বলজ্বল করছে। ঠাকুর আছে কি নেই সেটা স্পষ্ট নয় ফ্যাকলার কাছে, সে রোজকার অভ্যাসে প্রণামটা সেরে নেয় আঙুল ও বুকের সাহায্যে। জনশূন্য গোলটা ঘুরতেই দ্যাখে প্রাসাদের লুপ্তপ্রায় অঙ্গের মত গেটে আলোয় ভাসছে। সারা বছর যেখানে চাপ চাপ অন্ধকার, সেখানে এত আলোঃ কাল আবার কেউ ন্যাকড়া সরাতে আসবে! আর পুলিশের গুঁতোয় বাল সকালের কলেজের ব্যবসাটা গেলো। সকালে অই একই রোলের দোকানে লুচি ঘুগনি করে ফ্যাকলা। আবার রাগ আসে চোখের শিরাগুলোতে। কেন যে মেয়েগুলোকে দেখলো! আবার টানটান হয়ে ওঠে সে। একটানা ইনজিনের ঘ্যাড়ঘ্যাড়ে আওয়াজের মধ্যে ওই ইংরিজি কথাগুলো রেমন রোমশ মেয়েলি হাতের ঝাপটা হয়ে ঝাপটা মারছে কানে চোখে মুখে। সালা কানু স্যারের জন্য ইংরিজিটা আর শেখা হল না। বাপটাও বাঁড়া! ট্রেনে মাজনের হকার তার আবার ৪টে ছেলেমেয়ে! সব রাগ যখন পাছাশূন্য সিটে গিয়ে পৌঁছবে পৌঁছবে করছে, তখনই বাসটা ঢাকুরিয়া ব্রিজ টপকে শেষ স্টপে এসে গেছে। কন্ডাকটার বলে নাব আমি যাচ্চি এট্টু পর। আরও ২ জন লোক ছিলো তারা নেমে গেলো। ফ্যাকলা কিছুতেই আজ কন্ডাকটারের সঙ্গে ফিরবে না। অতএব *এট্টু পর* ব্যাপারটা কোনও প্রভাব ফেলল না তার ওপর। ফাঁকা কালিবাড়ি রোডের মুখে এসে ১টা জোরে নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। কাল ঠেকে গিয়েই বলতে হবে মেয়েগুলোর কথা। আহ মেয়েগুলো! আবার সামনে টানটান রাস্তা। টিউব লাইটের আলোয় আরও মসৃণ আরও নির্লোম। প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকায় সে। আবার পাইপ। ১টা শিস দেওয়া উচিত বলে ভাবতে ভাবতেই চুপসে যায়। সামনে আপে ডাউনে শেষ ট্রেন চলে যাওয়ার পরেকার স্থায়ী লাল সিগন্যাল। পাশে তার ঘরে ওঠার মইটা। অন্ধকার। বালের কাউন্সিলার। আলো ফেরাবে, জল ফেরাবে বস্তিতে! এখন আবার উঠে যাওয়ার গাওনা। আবার চোখে লাল স্রোত। মইয়ের শেষের আগের ধাপে এসে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে পাইপের কোল থেকে বের করে আনে চাবি। দরজাটা অর্থাৎ টিন ও বাঁশের অনিখুঁত মিশ্রনটা আওয়াজ করে খুলে ফেলতেই হাত তিনেক চওড়া একটা জায়গা। তারপর সোজা গিয়ে গোঁত্তা মারা মাটিতে শোয়ানো বিছানা। ঘরে ঢুকতে বাঁদিকে একই রকম হাত দুয়েক ফাঁক। ডানদিকে সেই একই বিছানা। যার ২টো দিক দেয়ালে আটকানো। আর ওই সামনের দিকের হাত তিনেক জায়গাতেই কিছু বাসন। আবার ওই বাঁদিকের দেয়াল বরাবর চললেই ১টা আলনা। তার ঠিক আগেই বাঁদিকে দেয়ালে বিপাশার ছবি। ফ্যাকলা জানে। পিঠ ফেরানো। ১টা মসৃণ হাসি। ফ্যাকলা জানে। স্পষ্ট লোমহীনতা। আজ আর আলো বা ছবি কোনওটাই লাগবে না।

৭

কথা ছিলো যতদিন না শহরের প্রত্যেকে টের পাচ্ছে ব্যাপারটা ওরা ৪ জন নোট রাখবে গোটা ঘটনাটার। দৃশ্য সমূহের। আদৌ কিছু ঘটছে কি না এরকম তার। তাদের ভুল হচ্ছে কি না তার। কিন্তু পাকে চক্রে চক্রের পাকে ক্লাউ আর সৌম্য একসঙ্গে নোট রাখা শুরু করলো। এটাই যুক্তি সংগত। কারণ ক্লাউ এখনও ঠিক করে সব অক্ষর চেনে না। এবং সেদিনের পর থেকে পরপর ৩ দিন সন্ধের মুখে ক্লাউকে নিয়ে বেরোতে শুরু করলো সৌম্য। কলসেন্টারে ক্লাউদিয়ার কাজ ঠিক মত উচ্চারণ শেখানো অতএব দরকার না থাকলে তাকে রাতে কাজ করতে হয় না। তার কাজ দিনের বেলা। এতদিন যে পরিচয়টা যে কোনও ভাবেই হোক ছিলো শুধু প্রয়োজনের। কিন্তু এই পরপর কেটে যাওয়া ৩/৪টে দিন (কোন দিন যে পরপর কাটে না!) একটু আলাদা ঠেকছে। যেমন আজ দ্যাখার তৃতীয় দিন। জুলাই মাসের বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ যখন সৌম্য ম্যাকফারসন স্কোয়ারে পাঁচিলের সামনে দাঁড়িয়ে সাদা ফুলহাতা ফতুয়া আর নীল খাদির পাজামা পরে, চুল টান টান করে বাঁধা। সামনে থিয়েটার রোড থানা, মিন্টো পার্কের দিক থেকে আকাশি হাতকাটা টপ আর সাদা একটা পাজামা বা প্যান্ট পরা ক্লাউদিয়া এগিয়ে আসছে। সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রথমবার নজর যাচ্ছে শরীরে। চুলটা সৌম্যরই মত হর্সটেল। একটু বড় স্তন খেলিয়ে রয়েছে প্রায় মধ্যচ্ছদা পর্যন্ত। তলপেটটা নিভাঁজ সমতল। ঠিকঠাক মাংসল প্রলেপ নিতম্বে। সাড়ে ৫ ফিট উচ্চতার একটা বিদ্যুৎ মুখ খোলেঃ

– কিছু দেখলে?
– অনেকগুলো। তুমি?
– জিনিসটা খুবই নতুন। তার ওপর এও অক্ষর ঝরে পড়ার ব্যাপারটা আমাকে একেবারে চমকে দিয়েছে।
– লিখেছো?
– না কিছুই লিখিনি। দেখি তোমারগুলো?
– চলো ভেতরে ঢুকে দ্যাখাচ্ছি – সৌম্য ম্যাকফারসন স্কোয়ারে ঢুকতে ইশারা করছে।
– না আগে একটু চা খাই চলো। ওই থিয়েটার রোডের মুখের চা খেতে আমার বেশ পছন্দ হয়।
– ১টা কথা বলো, তুমি এখানে, মানে এদেশে কতদিন থাকতে চাও?
– জানি না।
– কী বলতে চাইছো, তুমি কবে দেশে ফিরবে জানো না?
– ফেরার রাস্তা বন্ধ।
– কেন?
– দ্যাখো আমি, আমার দেশের আরও অনেক বাচ্চাদের মত আমার বাবাকে চিনি না।
– মানে?
– মানে যা বলছি তাই। আমি আমার বাবাকে চিনিনা। আমার দেশের আরও হাজার হাজার বাচ্চার মত।
– কেন, চেনো না কেন?
– দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের ফলে দেশে মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যায় একটা সময়ে। মানে পুরুষদের মৃত্যুর হার বাড়ার ফলে এটা হয়। এখানে পুরুষদের পছন্দের সুযোগ বেশি। আমার মা সেই বাড়তি মহিলাদের একজন।

হতবাক মুখ করে, খানিকটা উদাস সৌম্য বলে – তোমার ভাইবোন নেই?

– দাদা ছিল। ২ জন। ১ জন মেখিকো দিয়ে মার্কিন দেশে পালাতে গিয়ে ডাকাতের হাতে মারা পড়ে। অন্যজন গুয়াতেমালায় আছে শুনেছি।
– বুঝতে পারছি না তোমার কথা। তোমাদের সামাজিক গঠন।
– শক্ত। এখানে তোমাদের বাবা, মা, ইত্যাদি নিয়ে যে সামাজিক চেহারা, তা আমাদেরও ছিলো। এখন আবার আসছে। কিন্তু যুদ্ধ অনেক কিছু নিয়ে চলে গেছে।
– বুঝলুম। কিন্তু এখানেও তো,
– কখনো ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এ ট্যাংক দাঁড়াতে দেখেছো? – যেন শুনছেই না সৌম্যর কথা এই ভাবে ক্লাউদিয়া দাঁত চেপে বলে ওঠে।
– বুঝলুম, কিন্তু তুমি যেভাবে চলছো সেটা তো চিরস্থায়ী সমাধান হতে পারে না
– দেশে ফেরা যাবে না। স্থায়ী আবার কী? আমি বেশ্যাবৃত্তি করতে পারবো না!
– (নৈঃশব্দ্য)
– (নৈঃশব্দ্য)

এই হাই ভোল্টেজ (আ)বেগবান মেলোড্রামার ফাঁকে দুজনে যে পার্কে না ঢুকে চা না খেয়ে কলামন্দিরের সামনে চলে এসেছে সেটা খেয়াল হল বৃষ্টির গোঁতায়। ঘড়ির কাঁটা ৬টা ১৫ টপকে গেছে। নিরুপায় ভিজে রাস্তা পেরিয়ে পেট্রোল পাম্পটার মধ্যে তেল ভরা চলছে এমন একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসে ২ জন।

**৮**

ক্লাউদিয়া আর সৌম্য অরিন্দমের ঘরে পৌঁছলো প্রায় সাড়ে ৭ টা নাগাদ। বৃষ্টি/ সিগন্যাল খারাপ/জ্যাম/ শেষ পর্যন্ত হাঁটা প্রায় ১ কিমি। ঢুকেই দ্যাখা গেলো আগে থেকেই হাজির জোসেফ ঘুমোচ্ছে। পাশে অরিন্দম পড়ছে। আওয়াজে থামে। দেয়ালে হেলান দিয়ে ম্যাট্রেসে বসে থাকা অরিন্দমের ওপর এসে পড়া আলোটায় দ্যাখা গেলো হাতের বইটার নাম ফ্রিডম অ্যান্ড ডেথ, নিকোস কাজানজাকিস। অরিন্দম কি নিজেই নিকোস? শুধু গায়ের রংটা কালো! মাথা তোলা অরিন্দম বলে উঠলো

– আজ আর বিকেলে বেরোনো গেলো না। উফ, কী অসম্ভব ঝড়। তোরা কিছু দেখতে পেরেছিলি?
– দাঁড়া একটু বসতে দে! এই ঝড়বৃষ্টিতে যে বেরোতে পেরেছি এটাই কি যথেষ্ট নয়? বলছি, বলছি। দাঁড়া।

– ক্লাউ বর্ষা কেমন লাগছে? – অরিন্দম প্রায় কথা ঘোরাবার ছলে বলে।

ক্লাউদিয়া, দুনিয়ার বর্ষণমুখরতম মেগা শহরের অভিঘাতে কিছুটা বুঝি বেশিই সজীব। বলে – দারুণ!

– আজও ফ্যাকলা ঘুমোচ্ছে? – মাথা মুছতে মুছতে সৌম্য বলে।

– ওর পরিশ্রমটা ভাব। আর এই একগাদা বইয়ের মধ্যে বসে ও কীই বা করবে?

ক্লাউদিয়া প্রায় দুরন্ত গোলকিপারের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রসঙ্গটার ওপর। সে জোসেফের যা পরিচয় জানে তাতে বিস্ময় ছাড়া অন্য কোনও আবেগ ফোটেনি! – কিছু মনে কোরো না, এটা না প্রশ্ন করে পারছি না। জোসেফ তোমাদের বন্ধু কীকরে? মানে, ও তো, তোমাদের মত নয়, তাহলে, মানে, মানে, বুঝতেই পারছো, যা বলতে চাইছি ...

হেসে ফেলে অরিন্দম, আঙুল দ্যাখায় সৌম্যর দিকে। হাসতে হাসতেই বলে – এ ঠেক ওরই তৈরি। সবাইকেই ও এনেছে এখানে! – ক্লাউদিয়া ১টা ভ্রু কোঁচকানো চাউনি দ্যায়।

– হ্যাঁ। আমিই ফ্যাকলাকে এনেছি। ও আমার সঙ্গে ইশকুলে পড়তো!

– মানে? কি করে পড়তো? তোমাদের এখানে যা সামাজিক গঠন তাতে তোমার মত পয়সাওলা লোক তো সাধারণ ইশকুলে যাবে না।

এবার হেসে ফেলে সৌম্য। কী সহজে এই বিদেশি মেয়েটা এদেশের সামাজিক কিছু স্থির সত্য বুঝে নিয়েছে! এখানে ভালো ইশকুল, খারাপ ইশকুল স্থির হয় আর্থসামাজিক অবস্থান থেকে।

– হ্যাঁ। ফ্যাকলা আমার সঙ্গে এক ইশকুলে পড়তো।

– কী করে পড়তো?

– আমার বাবা মারা যাবার পর, আমাদের বাড়িতে মাতাল জুয়াড়ি কাকা ছাড়া আর কেউ ছিলো না যে আমাকে ইশকুলে ভর্তি করে।

– কেন মায়ের বাড়ি?

– আমার বাবার বেলেল্লাপনা ধরা পড়ার পর থেকে ওবাড়ির কেউ মায়ের সঙ্গে যোগ রাখেনি

– কেন?

– এটা তোমায় বোঝানো মুশকিল। আসলে মধ্যবিত্ত বাড়িগুলোয় এসব নিয়ে প্রচুর ট্যাবু আছে। আর এই জন্যই মায়ের শরীর অত তাড়াতাড়ি ভেঙে গেলো ...

– তারপর কী হল?

– কার পর?

– ইশকুল...

– ও আমি এন্টালি এলাকার একটা সাধারণ ইশকুলে পড়েছি। আমার সঙ্গে যারা পড়তো তারা কেউই আমার আর্থসামাজিক অবস্থান থেকে আসতো না। কিন্তু মা যেহেতু মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে তাই আমার ইশকুল যাবার পোশাকে আমার সেই অবস্থানের কোনও ছাপ পড়তো না। তা ফ্যাকলা আমার ক্লাসেই পড়তো।

– তোমার এত বন্ধু কী করে?

– হা হা। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। একদিন বিরক্তিকর ইতিহাস স্যারকে পেছন থেকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে কাগজ ছুঁড়ে মারা হচ্ছিলো। স্যার তখন ব্ল্যাকবোর্ডে কী লিখছিলেন। সব কাগজই যেহেতু স্যারের শরীরের অনেক আগেই মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো তাই স্যার নিজে টের পাননি। বোর্ড থেকে পেছন ফিরে আমাদের দিকে চাইতেই, দেখলেন ঘর বসার টেবিল চেয়ার বরাবর জড়ো হয়েছে অনেক কাগজের টুকরো। ১টা হাতে নিলেন। ওঁর কালো মুখ বেগুনী হয়ে উঠলো। গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন *কে শুরু করেছে?* আমি তো ক্লাস সিক্স, সৎ শিশু। বললুম *আমি*। এবং যথারীতি আমার সততার মূল্য না দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল হেডস্যারের ঘরে। এবং অত্যন্ত অপমানজনকভাবে ১টা খাতায় *আর কোনওদিন চাল্কু আনবো না, আর কোনও দিন পেটো আনবো না* ইত্যাদির পাশে লিখতে হল আমার নিরস্ত্র বাক্য *আর কোনওদিন গাল দেবো না*। আর তখনই জানতে পারলুম ওই কাগজটায় গালাগাল লেখা ছিলো। এবং চেয়ে চেয়ে দেখলুম কেউ বললই না যে আমি গাল দিই নি। গাল দেওয়া তো দূরে থাক আমি জানিই না গাল দেওয়া কাকে বলে। তারপর শুরু হল মার। সেই মার যখন মারাত্মক জায়গায় তখন এই ফ্যাকলা এগিয়ে এসে বলে যে তার ছোঁড়া কাগজটায় খিস্তি লেখা ছিলো। যদি স্যার সেই কাগজটা দেখে শাস্তি দিয়ে থাকেন তবে তা ফ্যাকলার প্রাপ্য। শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে দেখে আমাকে ছাড়া হয় এবং কাটা হয় নিরস্ত্র বাক্য। তারপর বার্ষিক পরীক্ষার জন্য ছুটি হয়ে যায়। কিন্তু ফ্যাকলা আর ইশকুলে ফেরেনি। বুঝি ওইদিনের মারাত্মক মার খাওয়াটা ও নিতে পারেনি। কেউই পারেনা সেটাই স্বাভাবিক।

– কিন্তু ওর সঙ্গে আবার কোথায় দ্যাখা হল?

– ১৪ বছর বাদে ওকে গোলপার্ক মোড়ে রোলের দোকানে দেখে আমি চিনতে পারি। তারপর আর কৃতজ্ঞতার ঋণ ঝেড়ে ফেলার সুযোগ আমি ছাড়তে পারিনি।
– কীরকম?
– মানে... মনে হয়েছিলো যদি আমাদের সঙ্গে আড্ডা মেরে ওর কিছু বৌদ্ধিক স্তরে কাজে লাগে।
– হল কিছু?
– কিছু তো হয়েছে। তবে খুব সিরিয়াস কোনও কথা চললে ও ঘুমিয়ে পড়ে।
– এবার তো তো নোটগুলো দ্যাখা – অরিন্দম বলে।

সৌম্য গম্ভীর অবস্থায়ই পকেট থেকে একটা ফর্দের মত কাগজ বার করে। তাতে ইংরেজিতে লেখা

১. সমস্ত সাইনবোর্ড/ হোর্ডিং থেকে বাংলা অক্ষর খসে যাচ্ছে
২. খাতা কলম ব্যবহার করে কোনও বাংলা শব্দ লেখা যাচ্ছে না।
৩. গত ৫ বছরের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত বাংলা বইয়ের অক্ষর ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।
৪. খবরের কাগজগুলো টের পাচ্ছে না। কোনও গণমাধ্যম টের পাচ্ছে না।

অরিন্দম খুঁটিয়ে ৩/৪ বার দেখলো ফর্দটা। – এই মিডিয়ার টের না পাওয়াটা ভারি অদ্ভুত তাই না? – অরিন্দমই প্রশ্ন করে।

– তুই দ্যাখ না তমালকে ফোন করে। ওরা কিছু দেখছে কিনা – সৌম্য বলে।
– কে তমাল? – ক্লাউদিয়া প্রশ্ন করে।
– তমাল একটা খবরের কাগজের সাংবাদিক। – সৌম্য উত্তর দিয়ে দ্যায়
– ঠিক। দাঁড়া – বলে অরিন্দম নিজের মোবাইল থেকে ফোন করতে থাকে।
– *কী রে কী খবর*
–
– *আমরা ঠিকই আছি*
–
– *নারে, আমরা মদ খাচ্ছি না।*
–
– *না, রোজ খাবার পয়সা নেই রে!*
–
– *বাজে কথা ছাড়, তোর কি বাংলায় লিখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে?*
–
– *না তোর লেখার কোয়ালিটি নিয়ে বলছি না। এমনি, মানে বাংলায় লিখতে গেলে কোনও অসিবিধে হচ্ছে?*
–
– *না... আমি বাংলায় কিছু লিখতে পারছি না।*
–
– *না। খাতায় পেন দিয়ে বাংলা অক্ষর লিখতে পারছি না!*
–
– *সকাল থেকে টানছি না। আমি সুস্থই আছি।*
–
– *নারে বাল! ড্রাগ আমি নিই না।*
–
– *ধুত! রাখছি।*

– সৌম্য, তমাল উল্টে আমাকেই চেটে দিলো!
– তার মানে কি কম্পিউটারে বাংলা লিখতে অসুবিধে হচ্ছে না?
– মানেটা বুঝতে পারছি না। যদি তাই হয় তাহলে আমার মোবাইলেও লেখা যাবে না। আমারটায় বাংলায় টাইপ করা যায় – সৌম্য খুটখাট টাইপ করতে শুরু করে। ৩০ সেকেন্ড স্তব্ধতার পর অরিন্দম ঝুঁকে পড়ে প্রায় চেটে নিতে থাকে বাংলা ডিজিট্যাল অক্ষরগুচ্ছ ...

**৯**

ফ্যাকলা বহু চেষ্টা করেও তার নিজের চারপাশের কোনও বাড়িতেই বাংলা লেখাপড়া নিয়ে কোনও অসুবিধে টের পাচ্ছিলো না। অথচ অরিন্দম আর সৌম্য তাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা বাংলায় লিখতে পারছে না। সে তার পাশের ঘরের পুঁটির খাতায় উঁকি মেরে দেখেছে, দেখেছে তার বহু দিনের পুরনো সংগ্রহ *রোমান্টিক প্রেমপত্র:রসে ভরা শায়রী সহ* বইটিতেও। দিব্বি ঠিক আছে সব। *নিতম্ব ভারি তব দোলে চিত্রাকারে/ পীন পয়োধর দ্বয় মোর মন হরে।।* খাসা পড়া যাচ্ছে। নিজে লিখেও দেখলো: একই রকম। লেখা যাচ্ছে তো! আজ দুপুরে দেখা হবে সবার সঙ্গে। সবাই মিলে একসঙ্গে ঘুরতে বেরোবে শহরটা। দেখবে কোথায় হাল কেমন। আর তখনই সবাইকে বলবে তার নিজের অভিজ্ঞতা। সঙ্গে নিয়েই যাবে পুঁটির লেখা একটা পাতা, আর তার নিজের বই। কী যে বলে না এরা!

বাড়ি থেকে বেরিয়েই চোখ দাঁড়িয়ে যায় ফ্যাকলার। বাবুবাগান লেনের মুখের সেলুনটার সাইনবোর্ড একেবারে সাদা। টিনটা চকচক করছে। আর সেদিকে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে না চলা সেলুনের বুড়ো মালিক। সে না প্রশ্ন করে পারে না – কী হয়েছে কাকা?

– আরে দ্যাখ না, ৩/৪ দিন ধরে সাইনবোর্ড থেকে রং ঝরছিলো, আজ সব ফাঁকা।
– ও! ফ্যাকলা চুপ করে নিজের হাঁটায় মন দিতে যায়।
– সবে ৬ মাস হল রং করিয়েছি, বাআজে রং দেবে যত! ... ফ্যাকলা হাঁটা দিয়েছে ...
– কী যে সব রং দেবে! বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ কথা চালিয়েই যাচ্ছেন ...
– (ফ্যাকলা অনেকটা দূরে চলে গেছে)

শেষপর্যন্ত যখন গোলপার্কে নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছল ফ্যাকলা, তখন সেখানেও অবস্থাটা খুব আলাদা কিছু নয়। সময় মোটামুটি স্থির বলে মনে হচ্ছে। বাকি বন্ধুরা যখন হাজিরা দিলো, তখন সামনে হিরে কোম্পানির *আমাদের 'হীরক' জয়ন্তী* পরিণত হয়েছে *মা র ' রক' ন্তী* - তে। বেশ কিছু লোক দেখছে জিনিশটা। তার ঠিক উল্টোদিকে, গড়িয়াহাট ব্রিজে ওঠার মুখে বাঁ হাতের ১টা ব্যাংকের হোর্ডিং তখনও উজ্জ্বল। সেখানে লেখা আছে ইংরেজি ভাষায়। ওরা ট্যাক্সি ধরে উত্তরমুখে রওনা দেওয়ার পর থেকে যেখানেই চোখ পড়ছে মোটের ওপর একই চেহারা। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মুখে ১টা খুব চেনা সাইনবোর্ড চকচকে সাদা হয়ে গেছে। সামনে ১টা জটলা। ট্যাক্সির মধ্যে ক্লাউদিয়া ১টা বহুজাতিকের গ্লোসাইন দেখিয়ে বলে

– এগুলোর তো কিছু হয়নি।

অরিন্দম উত্তর দ্যায় – আমি যা দেখছি তাতে যন্ত্রে লেখা অক্ষরগুলোর কিছু হয়নি। ৫ বছর আগেকার বইগুলোয় কিছু হয়নি।

ফ্যাকলা ট্যাক্সিচালকের পাশ থেকে বলে ওঠে আমাদের ওখানে সবাই লিখতে/পড়তে পারছে। এই দ্যাখ – বলে প্যান্টের পকেট থেকে পুঁটির খাতর একটা পাতা আর দলমোচড়া হয়ে থাকা *রোমান্টিক প্রেমপত্র:রসে ভরা শায়রী সহ* বের করে দ্যাখায়।

– অদ্ভুত তো! – সৌম্য বলে।
– তাহলে কি এটা পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু? ক্লাউদিয়া প্রশ্ন করে
– ওই দ্যাখো – সৌম্য ট্যাক্সির বাইরে আঙুল দ্যাখায়। সবাই বাইরে চোখ পাঠালে, মণিতে ফুটে ওঠে বালিগঞ্জ পোস্ট অফিসের পুরনো বাংলায় লেখা সাইনবোর্ডটা থেকে অক্ষর খসা শুরু হয়েছে। কয়েকটা খসে গেছে। আর কয়েকটা ফুলে উঠেছে জলফোসকার মত। এরপর মৌলালি অব্দি যেখানে গেছে সেখানেই একই চেহারা। ওরা যখন যে যার বাড়ি ফিরলো কলকাতার লোকের দিন শেষ তাড়াতাড়ি আরও তাড়াতাড়ি তখন নির্মল চন্দ্র স্ট্রিটের এক নামি মিষ্টির দোকানের ঢালাই করা নাম থেকেও একটা অক্ষর খসে গেছে।

কদিন লিখতে না পেরে বিরক্ত অরিন্দম প্রতিদিনের মত ইংরেজিতে নোট লিখতে বসার আগে নিজের জোড়া জানলাটার সামনে দাঁড়ায়। সামনে স্বাভাবিক মধ্যরাতের নৈশঃব্দ্য। হঠাৎই কী এক খেয়াল বসে ছোট এফ এম রেডিওটা চালিয়ে দ্যায়। এটা কদিন আগে ফ্যাকলা ফেলে গেছে। একটু তেলচিটে। কিন্তু চলে:

– *এই মুহূর্তে you are listening to Hot FM, আমি RJ সঙ্গিনী। আমার সঙ্গে share করুন আপনার secret desire. আজ রাতে be a little wild! আমার phone number টা ভুলবেন না যেন।*

একেবারেই ঘুমমাখা ১টা সুড়ঙ্গ তৈরি হচ্ছিলো সামনে। হঠাৎই কানে এলো আপনার প্রতিদিনের পরিষ্কার potty- র জন্য ল্যাক্সি ইসবগুল। No উঃ No আহঃ স্রেফ আহা!

– বাল – নিজের মনেই বলে ওঠে অরিন্দম – যেন পটি বললে মালটা প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া যাবে। বিড়বিড় করতে করতে সে নোট লেখার খাতাটা খোলে। পাশে তখনও রেডিও চলছে। *আপনি কি lonely? এই বিরাট শহরে নিজেকে lost lost লাগছে? come tell me আপনার এই wet night এ কেমন লাগছে? share your feelings, SMS করুন ... ততক্ষণ আমরা ১টা গান শুনে ফেলি।* অমনি পাশ্চাত্য বাদ্য সহকারে বিকৃত বাংলা উচ্চারণে গ্রাম্যভাষার গান *লাগাই লাগাই করে গো/হাঁফাই হাঁফাই করে গো/ আমার গা সমসম করে গো/ আমার বুক সমসম করে/ বুকের ভেতর গুবরে পোকা লাফাই লাফাই করে*

অরিন্দম কাঠ হয়ে গিয়েছিলো। শুনতে, বুঝতে চেষ্টা করছিলো চুপচাপ।

– *গানটা ছিলো আমাদের প্রিয় মাটি ব্যান্ডের। আজ এই midnight safari তে আমরা পেয়েছি মাটির সানিদাকে। আচ্ছা সানিদা, আপনারা এরোকম ১টা different band তৈরি করার কথা ভাবলেন কীকরে? I mean, guitar আর একতারা, তবলা আর drums, what a combo pack!*

*– You are absolutely right. আসলে আমি জন্মের কয়েকদিন পর থেকেই, you can say right after my birth, I took guitar, আর একতারা তবলা all signifies my root. I couldn't avoid my root. But I must say we brought international flavour to Bengali music! It's a fusion of every single thing, a blend.*

অরিন্দম একদম শূন্য ১টা মাথা নিয়ে দুম করে বন্ধ করে দ্যায় রেডিওটা। নোটবইয়ের পাতা ফাঁকা রেখে শুয়ে পড়ে।

সকালের খবরের কাগজে দ্যাখা গেলো ভেতরের দিকে ১টা ছোট্ট খবর: কলকাতার বিভিন্ন হোর্ডিং এ রং চটে যাচ্ছে। আবহাওয়া দফতরে খবর নিলে তাঁরা জানান বাতাসে তেমন কিছু হেরফের হয়নি। সৌম্য কাগজটাকে মুড়ে অফিসে বেরোতে তৈরি হয়। একইরকম দৃশ্য, স্বাভাবিকভাবে একটু বেশিই দেখতে দেখতে অফিসে ঢুকে পড়ে।

সন্ধের পরে আবার যখন ঠেক, নোট মেলানোর সময়, তখন দ্যাখা গেলো ৩ জন পুরুষই কার্যত বিষণ্ন। ক্লাউদিয়াই প্রথমে মেলে ধরে তার পাতা।

১ সর্বত্র জলফোসকার মত ফুলে উঠেছে বাংলা অক্ষর
২ আমার দ্যাখা সব এলাকাতেই ৫০% বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড হোর্ডিং ফাঁকা
৩ কাউকেই বাংলা লিখতে পড়তে শুনছি না

– আমাদের সকলেরই দ্যাখা মোটামুটি এক – শুধু ফ্যাকলা অন্য কথা বলছে। অরিন্দম খানিকটা নেতা গোছের ভাব নিয়ে নিয়েছে।
– শোন আমি লাইন টপকে বস্তির বাইরে বেরোলেই তোরা যা বলছিস সবই দেখতে পাচ্ছি। শুধু বস্তির ভেতরে কিছু দেখতে পাচ্ছি না – ফ্যাকলা বলে
– আরও ১টা জিনিস আমার নজরে এসেছে, যত *হেকিম/লিঙ্গ ছোট বাঁকা?* এইসব পোস্টারের কিছু হয়নি। কিছু হয়নি আয়ুর্বেদিক দাবাখানার সাইনবোর্ডেরও – সৌম্য বলে – তার মানেটা কী দাঁড়ালো?
– মানেটা সহজ! গরীবঘরে এই অক্ষর খসার কোনও প্রভাব নেই।
– শুধু গরীব কেন বড়লোক বাড়িগুলোতেও দ্যাখা দরকার। আমরা শুধু মধ্যবিত্ত বাড়িগুলো দেখেছি।
– তুই শুধু নিজেকে দিয়ে ভাবিস সৌম্য, বড়লোক বাড়িগুলোতে বাংলা উঠে গেছে আজ অনেকদিন – অরিন্দম বলে।

– চল শুভায়ুকে ফোন কর - সৌম্য বলে

– কাকে?

– ঐ যে ঠাণ্ডা নেতানো বেগুনীর মত বাহু ও উরু বিশিষ্ট কবি!

– কেন?

– দ্যাখ না ওর কিছু হচ্ছে  কী না। আর এই নে আমার ফোন থেকে কর,  স্পিকার অন রাখ আমিও শুনবো।

– আরে তুই?

– হ্যাঁ,  শুভায়ু,  শোন একটা দরকার আছে।

– হ্যাঁ তা নাহলে তুই আমায় ফোন করবি কেন?

– না এমনিই তোকে ফোন করতুম।

– বাজে কথা রাখ। আমি গত মাসে ৩ বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি জানিস!

– না মানে,

– মানে আবার কী,  জানিস তো গ্ল্যাডস্টোন ধামুক কে  আমি একটা মেইল লিখেছিলুম এই যে খণ্ডগ্রামের যুদ্ধ তাই নিয়ে বেটা পুরো এড়িয়ে গেলো

– না শোন

– শোন তুই - আমার ই মেইল আইডি কারা হ্যাক করে নিয়েছে

–আরে শোন না,

– তুই শোন,  পড়েছিস সুবীরদার লেখাটা,

–কোনটা,

– আরে *তলদেশের* টা,  আবার কোনটা! কাঁদিয়ে দিলো রে,  পড়। পড়। সুবীরদা জানেন বাঙালির বুকের কোথায় চাপ দিলে কতটা জল পড়বে আহা কী লেখা! শোন আমায় আবার বেরোতে হবে,  নিখিলবঙ্গ ভ্যানচালক সমিতির সভা উদ্বোধন করতে যাবো। রাখি বুঝলি।

– যা ব্বাবা! এর তো কোনও হেলদোল নেই।

– না। এ কেন কারুরই থাকবে না। এদের দিন যায় চাঁদে মঙ্গলে আর ভ্যানচালক সমিতি নিয়ে।

– চাঁদে মঙ্গলে মানে?

– মানে কিছুই নয়,  এরা সুবীরদা বা ওই জাতীয় কারুর বাড়ি গিয়ে প্রতি রোববার গিয়ে বলে আপনি চাঁদে যা লিখেছেন না,  আপনি মঙ্গলে যা লিখেছেন না!  আর সুবীরদা গোছের লোকজন বছরের পর বছর ধরে বাঙালি জাতির জন্য অশ্রুসজল সামাজিক পালা লিখে চলেছেন!

তাহলে একবার পলাশদা কে ফোন কর -
পলাশদা এখন কি বাড়িতে থাকবে?
দ্যাখ না-

আবার একই পদ্ধতিতে স্পিকার অন করে লাইন গেলো পলাশদার ফোনে

– আরে তুউউই। কী সৌভাগ্য আমার।

– শোনও পলাশদা আমি কিছু লিখতে পারছি না

– পারবি কীকরে। পড়িস? পড়,  বুঝলি পড়। কতদিন নিজের ভেতরে ঢুকে লেখা যায়?

– না মানে আমি বলছি

– আরে থাম তোর বলা,  পড়েছিস দময়ন্তির বইটা?

– কী বই?

– Seduction and abuses of bitches in post colonial novels: a critical analysis

– কী?

– হুঁ হুঁ বাওয়া। তা খবর রাখবে কেন? জানো এটা কার্পার চুলিন্স ছেপেছে? এই শোন, একটু থিওরি টিওরি পড়। কতদিন

– আর নিজের ভিতরে ঢুকে লেখা যায়?

– না, মানে আমি বাংলায় লিখতে পারছি না

– কী সব বাজে বকছিস? শোন আজকাল সবাই ইংরেজিতে লিখছে তুইও লেখ, শোন, তোর বৌদির আজ বিপত্তারিনী ব্রত আছে। আমাকে যেতে হবে বুঝলি। পরে কথা হবে।

–আমি জানতুম পলাশদাদের কাছে কিছু পাবি না! অরিন্দম বলে সৌম্যকে

– কীকরে জানব বলতো। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায় সে যদি এ খবর টের না পায় তাহলে কী হবে!
আরে এরা বোর্ডে বা অন্য জায়গায় লেখে কতটা। এখন পরীক্ষার সময় নয়, তাহলে টের পাওয়া যেত। বাকি সময় এরা ওই পোস্টকলোনিয়াল উপন্যাসে কুত্তির অপব্যবহার নিয়ে ভাবে!

– সমরদা কী পড়ায়? এতক্ষণ চুপ থেকে ক্লাউদিয়া বলে।

– বাংলা!

আস্তে আস্তে সবাই যে যার পথে পা বাড়ালে মাঝরাত নাগাদ আবার অরিন্দম রেডিও খুলে দ্যায়।

*you are listening to Hot FM, আমি RJ রঙ্গিলা। আপনার সঙ্গে থাকবো পাক্কা* 2 hours, we'll talk a lot on শহরের trend। আর গান তো আছেই!

Hot FM

Midnight Safari

RJ Rangilaar sange

**১১**

পরের দিন রাস্তায় বেরোলে যে সব কথাবার্তা কানে এলো তা কতকটা এরকম:

*মোড় ১*

– শুধু সাইনবোর্ডগুলোতে রং চটেছে।
– কে জানে কী যে সব রং দ্যায়!
– না না দূষণ বুঝলেন না দূষণই আমাদের মারবে ওই দূষণ।
– আরে, দেকুন, দেকুন, সানবেলুন্সের সাইনবোর্ডটাতো দিব্বি আছে!
– তাহলে? শুধু বাংলায় লেখাগুলো উঠে যাচ্ছে নাকি?

*মোড় ২*

লোকে ১টা মাঝারি জটলা পাকিয়ে দেখছে একটা খুব পুরনো সেলুনের দিকে।
– এ কী ঝামেলা বলো দিকি! নতুন রং করা বোর্ডটা থেকে রাতারাতি রং ঝরে গেলো!
– না, না তা কি করে হবে?
– শুনেছো নাকি নগেন কুণ্ডুর মিষ্টির দোকানের সিমেন্টে লেখা নামটাও ভেঙে পড়েছে কাল?
– তাই নাকি, দ্যাকো দিকি, কী যে সব হচ্ছে
– অই দ্যাকো, পেপসির ইংরিজি হোর্ডিংটা দিব্বি আছে, পাশেই বাংলাটা রেমন ঘেয়ো হয়ে গেছে!
– তাহলে? শুধু বাংলায় লেখাগুলো উঠে যাচ্ছে নাকি?

এই শেষ প্রশ্নটা যে কয়েকঘন্টার মধ্যে উক্ত মোড়গুলোর মত সমস্ত মোড়ে কমন হয়ে উঠবে, ছড়িয়ে যাবে বাস, মেট্রো, অটো, এমনকি ট্রামে চড়া জনতার মধ্যেও সেটা বুঝতে পারেনি সরকারি, বেসরকারি, *আমরা বা ওরা* কোনও গণমাধ্যম। ফলত আমাদের এতক্ষণের পরিচিত পাত্রপাত্রীরা যখন মেট্রো সিনেমার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে নক্ষত্র নেটওয়ার্কের বাংলা খবরের চ্যানেল সমৃস্বির গ্লোসাইনটাকে খসে পড়তে দেখলো এবং সেই পতনের হাত ধরে এলো শর্টসার্কিট এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনকে ঘিরে রাখা লোহার রেলিং এ পাছু ঠেকানো হিন্দুস্তানি চানাওলার ওঁয়া ওঁয়া চিৎকার কিছুই লাইভ দ্যাখাতে পারলো না চ্যানেল।

– প্রথম কোনও যন্ত্রে লেখা বোর্ড পড়লো
– তোর মোবাইলে লেখা যাচ্ছে কিনা দ্যাখ।

প্রবল হুড়োহুড়ি, ভিড়, হুটার, ইত্যাদির শব্দে ও দৃশ্যে ঠিক বোঝা গেলো কে কাকে বলছে এসব কথা। শুধু দ্যাখা গেলো সৌম্য তার মোবাইলে খুটখাট করতে বলছে – দ্যাখ, দ্যাখ, বাংলায় লিখলে অক্ষরগুলো কেমন ভেঙে পড়ে যাচ্ছে।

– আমি তো বললাম আর যন্ত্রে লেখা যাবে না – দ্যাখা গেলো অরিন্দমকে
– কী করে বুঝলে? – ক্লাউদিয়া বলে
– ওই যে গ্লোসাইনটা ভেঙে পড়লো বিনা ঝড়ে। প্রথমে অক্ষরগুলো, পরে গোটা গ্লোসাইনটা – সৌম্য উত্তরটা দিলো।

গোটা এলাকা ঘিরে নিয়েছে দমকল পুলিশ ইত্যাদি আবশ্যিক পরিষেবা। এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে সমস্ত হোর্ডিং, সাইনবোর্ড, মেট্রো স্টেশনের নাম, বাসের বিরলতম বাংলায় লেখা নম্বর, তারপাশে অবিরল জায়গার নামগুলো। ৪ জন আতঙ্কিত যুবা আস্তে আস্তে শহরের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করতে লাগলো গোটা শহরটার থমকে যাওয়া। একদম থেমে গেছে। এই অবস্থায় আমরা শহরের মধ্যবিত্ত গেরস্ত বাড়িগুলোয় একটু নজর দেবো। বিশেষত যে সব এলাকায় গ্লোসাইন ভেঙে পড়া থেকে সৃষ্ট শর্টসার্কিট নেই। অর্থাৎ বিদ্যুৎ = টেলিভিশন জীবন্ত।

*বাড়ি ১*

টিভি চলছে। স্বাভাবিক। সামনে ২ জন তরুণ। দেখে মাঝ ২০ বলে মনে হয়। তারা ১টা ইংরেজি অ্যাকশানমূলক চ্যানেল দেখছে।

*বাড়ি ২*

এখানে ১জন ৫০ পেরোনো প্রোঢ়া হিন্দি সিরিয়াল দেখছেন।

*বাড়ি ৩*

এখানে সেই তরুণযুগল। তবে এরা নারী ও পুরুষ। দেখে পোশাক দেখে, আচরণ দেখে মনে হচ্ছে অফিস ফেরত। এরা দেখছে ইংরেজি ১টি খবরের চ্যানেলে শেয়ার বাজারের উত্থানপতনের তালিকা।

*বাড়ি ৪*

এই তো সেই নক্ষত্র নেটওয়ার্কের (একে কি জালিকার্য বলা যায়? কোনও বাংলাশিক্ষক যদি বলে দিতেন!) সমৃদ্ধি চ্যানেল। তারা এখন ধর্মতলা চত্বরে লাইভ। গোটা পরিবার টিভির সামনে। ব্রেকিং নিউজ এ রোমান হরফে বাংলা কথামালা চলে যাচ্ছে নাচতে নাচতে। এই চ্যানেলেই দেখতে পাচ্ছি মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর বদলে মুখ্যসচিব বলছেন।

– বোঝা যাচ্ছে না। একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না কী থেকে এই অবস্থা উদ্ভুত। তবে উদ্ভুত যেকোনও পরিস্থিতিই কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে।

বুমের ঝাঁক পেছনে অনেক প্রশ্ন – এটা কি ভিন গ্রহ থেকে হামলা?

– এটা কি দূষণের ফল?

– এটা কী?

এরপর আর শোনা গেলো না। মুখ্যসচিবের ক্রমাপসৃয়মান পাছা সহযোগে ক্যামেরা চলে গেলো রাজ্যের প্রকৃত রাজধানী শাসকদলের প্রধান কার্যালয়ে। সেখানে ১জন মোটা লালচে ফর্সা, সম্পূর্ণ টাকমাথা ৬০ টপকানো লোক অদৃশ্য/অগণন শ্রোতাদের বলছেন

– আমরা জানিনা কার এমন কীর্তি। কীসের জন্য এ অবস্থা। তবে বিরোধী কেউ কেউ যা বলছেন তা আমাদেরও কানে এসেছে। তাই আমি তাদের সাবধান থুড়ি আহ্বান করছি শুধুমাত্র হাত মিলিয়ে  শুধু ত্রাণ ও উদ্ধার কার্য চালাই।

– স্যার শুধুমাত্র হাত বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

– ছ্যাঃ। এটাও বোঝেননা? হাত মানে শুধু হাত অন্য কোনও অঙ্গ নয় থুড়ি আদর্শ নয়। আমার তরুণ বন্ধুদের আমি রং তুকি নিয়ে হারানো অক্ষরগুলো ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছি।

– কিন্তু লেখাই তো যাচ্ছে না স্যার।

– আপনি কি কোথাও লিখতে পারলেন স্যার?

– …

– আপনারা এতক্ষণ দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি দিনকর জানার রিপোর্ট। এবার আমরা চলে যাবো সরসরি ধর্মতলায়। সেখানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন ২ জন – টিভিতে খবর পাঠিকার কাছে প্রত্যাবর্তন। আবার কোলাহল। পুলিশ, কাঁদানে গ্যাস, ঢিল, বর্ম।

– কী হুজ্জুতি রে বাবা!

– ভাগ্যিস বাবুসোনার ভার্নাকুলারও নেই। পরীক্ষায় যে কী হত।

– ভাবো তো বস্তির ছেলেমেয়েগুলোর কী হবে!

– ওসব তুমি ভাবো।

– চলো একটু খেলা দেখি

– ছিঃ! বাবু এক্ষুণি কোচিং থেকে ফিরবে।

– ধুত! খেলা বললেই কেন সেক্স ভাবো বলো তো?

– আমি আবার কী ভাবলুম …

আসুন আমরা নারীপুরুষের এই ঘন আলাপ থেকে ছুটি নিই।

পরের দিনটা বাঙালীর ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খারাপ দিনগুলোর মধ্যে ১টা। এদিন বাংলা সংস্কৃতির একদা রাজধানী (এখনও লোকে তাই মানে, কিন্তু মজা হল, এ শহর ঔপনিবেশিক, ফলে যত ঔপনিবেশিক ঝুলনমায়া কাটবে, মরবে এ নগরী) কলকাতায় একটাও বাংলা খবর কাগজ বেরোলো না। যে কাগজটা ভূত ছাড়া কাউকে ভয় পায় না, ঈশ্বর ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করেনা তারা ২ পাতার ১টা বুলেটিন ছাপলো রোমান হরফে। বোঝা গেলো তারা ভীত। *সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক* ১পাতা বুলেটিন ছাপলো ইংরেজি ভাষায়। তারা ঘোষণা করল তারা আক্রান্ত। সঙ্গে এও জানালো যে তারা ফিনিক্স পাখি। অর্থাৎ এইসব আক্রমণের আগুন থেকে তারা বেরিয়ে আসবেই। দুপুর নাগাদ সেই ধর্মতালার মোড়ে বসল প্রতিবাদসভা। সেই চানাওলা যেখানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিলো, সেই রেলিং হল শহীদ বেদি। এই সুযোগে ১টি লিটল ম্যাগাজিন যারা এতকাল অঘোষিতভাবে ছিলো অই ফিনিক্সপাখি দৈনিকটির ভাই, তারা নিজেদের তুলনা করল ফরাসী কবি শার্ল বোদলেয়ারের অ্যালবাট্রস পাখির সঙ্গে (এখানেও পাখি নামক গোত্রটি সাধারণ) এবং উপস্থিত জনতা এই উপমা বুঝছেনা দেখে নাক উঁচু করে নেমে এলো স্টেজ থেকে। এবার মঞ্চে উপস্থিত বাংলার জনপ্রিয়তম ফিউশন শিল্পী, ওজন ১১০ কিলো, কালো রং, ৫ ফিট ১১ ইনচি উচ্চতা বলছেন – we need অস্ত্র and kill those killers. এখনও যদি আমরা silent থাকি তাহলে … (ফোঁপানি এবং আসনগ্রহণ)। এবার বাংলার জনপ্রিয়তম ঔপন্যাসিক (বিক্রি ৭০০ কপি) বলে চলেছেন – *আমি খোঁজ নিয়েছি, ঢাকায় কিছুই হয়নি। কিন্তু এখানে? আমরা ভাষার ওপর যে কোনওরকম আক্রমণ ঠেকাবোই। প্রয়োজনে মোবাইলের মেসেজের ভাষায় আমরা বেঁচে থাকবো।* সামনে জনগণের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন *আর আছে টাই বা কী?* আবার বলছেন ঔপন্যাসিক। বয়েস হয়েছে। চেহারার জন্য নবীন লেখকরা তার নাম দিয়েছে বাংলা সাহিত্যের এয়ারপোর্টে জাহাজ। কোনও প্লেন উঠতে বা নামতে পারছে না! সামান্য হাঁফিয়েও গেছেন বুঝিবা। এই সময়টা তাঁর লেখার সময়, জানিয়েছিলো ১টি দৈনিক। অনেক লিখেছেন সারাজীবন। প্রকাশিত উপন্যাস ২৫০। কবিতা, নাটক কী লেখেননি। তাও সব মিলিয়ে ৬০/৭০ টাতো হবেই। আজ কিছুটা ক্লান্ত বুঝিবা। বিষণ্ন। যে ভাষায় অত কোটি কোটি অক্ষর উনি লিখেছেন, সে ভাষায় আজ আর কিচ্ছুটি লেখা যাচ্ছে না। কাঁপা কাঁপা গলায় বলছেন – *এ ভাষার মৃত্যু হবে না। হতে পারে না। হতে পারে না* … এরপর গায়ক ও নাট্যকর্মীদের প্রদর্শন। এই একই দিনে সন্ধে বেলা টিভি খুললে দ্যাখা গেলো তার ছিঁড়ে মৃতের সংখ্যা ১৪ হয়েছে। আর একই অবস্থা দ্যাখা দিয়েছে সমস্ত শহরাঞ্চলে দ্যাখা দিয়েছে। গ্রামে যেহেতু সব মিলিয়ে অক্ষরের চলটা একটু কম তাই অতটা স্পষ্ট নয়। তবে যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে সেখানে খুব একটা প্রভাব পড়েনি। এই অবস্থায় ১টা খবরের চ্যানেলে দ্যাখা যাচ্ছে ১ মাঝবয়সী কবি বলছেন সেই বাংলাভাষা বাঁচানোর সভায় না যাওয়ার কারণ: *আমি ওঁদের সঙ্গে আছি, কিন্তু ওদেরই ১ জন মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছে অক্ষরঠোকরা! আমি আর তাকে আপনি সম্বোধন করতে পারছিনা। সে বলেছে অক্ষরঠোকরা। মুখ্যমন্ত্রীর অপমান আমারও অপমান। তাই…*

মুহূর্তে ক্যামেরা চলে যাচ্ছে শহরের নানা প্রান্তে যেখানে প্রধান বিরোধী দল (আসন সংখ্যা ৪) তাদের চিফকে নিয়ে রাস্তায় নেমে সরকারের পদত্যাগ দাবী করছে। দিল্লি থেকে এসে গেছে সিবিআই দল, তাদের সঙ্গে এসেছে ১ উচ্চ পদস্থ প্রতিনিধিদল। তারা এরইমধ্যে রাজ্যে বিভিন্ন ধারা জারি করার দাবি জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রে। আরেকটু পরেই শোনা গেলো এক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো বন্ধ করার নির্দেশ দিলো সরকার। কেন্দ্রে এমনিতে শত্রুপক্ষ সরকার। তার ওপর তাদের এই বিমাতৃসুলভ আচরণ এই দুঃসময়ে। ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা দেখে কেউ কেউ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিও জানিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ঘরে বাইরে (বহুজাতিকের অফার বা উপন্যাস নয়) , দলে নির্দলে সমালোচনার কাস্তে ও হাতুড়ি খেয়ে যখন চোখে তারা দেখছেন বলে দাবি করছে তাঁর সাধের ২০ শতকের বামপন্থার ইশকুলে পড়া লোকজন, তখন সত্যি সত্যি তিনি যে কোথায় তা কেউ জানে না। বেচারা! এমনিতে নানা মস্ত্রকের চাপে তিনি যথেষ্টই কাবু থাকেন। সেই চাপ কাটাতে তিনি প্রাক্তন সোভিয়েত ব্লকের অ্যাকশানমূলক ছবি দ্যাখেন। যৌবনে ১জন প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে তিনি বিয়ে করেছিলেন ১ সাপুড়ে মেয়েকে। সেই মহিলা ছিলেন নিখিলবঙ্গ সাপুড়ে সমিতির মহিলা শাখার দিনাজপুর বিভাগের মাথা। তাঁর একমাত্র সন্তান (পুং) মায়ের পেশা বেছে নিয়েছে। সে চলে গেছে অসমে। এমনিতে বিষণ্ন তিনি। রাজ্য, বাড়ি, সংসার সব মিলিয়ে কী চাপ! এবার মিডিয়া তাঁর বেডরুমে ঢুকে পড়েছে। তাঁর পোষমানা চ্যানেলগুলো নরম করে হলেও দিচ্ছে ভালোই। এরকমই ১টি, আমাদের পরিচিত নক্ষত্র নেটওয়ার্কের সমৃদ্ধি তাঁর শোয়ার ঘরে স্পাই ক্যাম লাগিয়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে দেশবাসীকে।

১টা লিঙ্গি পরে খালি গায়ে গলায় সাপ জড়িয়ে বসে আছেন তিনি। আর কী যেন বিড়বিড় করছেন। স্পাইক্যামের সঙ্গে থাকা মাইক্রোফোনটি দুর্বল বলে শোনা যাচ্ছে না কিছু!

## ১৩

রাত ১১টা ৩০ এর বালিগঞ্জ ফাঁড়ি। সবকটা সিগন্যাল হলুদ হয়ে গেছে। প্রবল যানবাহনের চাপে বিপর্যস্ত কলকাতা যখন অভ্যস্ত নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর তার নিঃশ্বাস বাষ্প জমে উঠছে জানলার কাচে। দৃশ্যমান সেইসব জানলায় কি দীর্ঘশ্বাসও থাকে না ১টা ২টো? আকাশটা অপুষ্ট কমলালেবুর কোয়ার মত কোথাও হালকা কমলা। কোথাও বা দামি গাঢ় ভূমধ্যসাগরীয় লেবু। বৃষ্টি এলো বলে। পার্কটায় জেগে আছে কিছু পাখি। বিকট ডেকে উঠছে কয়েকটা কাক। অবিকল বস্তিবাড়িতে শোয়ার আগে যেমন ঝগড়া হয় তেমন। সারা শহরের সমস্ত বাংলা অক্ষর জলফোসকার মত ফুলে উঠে খসে গেছে আজ দিন দশেক। নতুন করে লেখার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। সবকিছুই আস্তে আস্তে অন্য অনেককিছুর মতই সহ্য হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে দক্ষিণমুখে আস্তে আস্তে পা চালাচ্ছে বন্ধুদল সমেত অরিন্দম। কথাবার্তা চলছে পরিশ্রান্ত ঢঙে।

– সৌম্য তোর কী মনে হয়, কোন অস্ত্রটা আমাদের জন্য? দ্রাগুনভ না আর পি জি ৭?
– দ্যাখ ২টো ২ রকম।
– কামানটাই ভালো, মারতে হলে ওটাই সুবিধে। ঘাড়ে করে নিয়ে ঘাপ করে ঝেড়ে দাও! ফ্যাকলা বলে।
– না রে অত সোজ নয়। মালটা চাগাতে হলে দম হালকা হয়ে যাবে। অরিন্দম বলে।
– দাঁড়া। ঠাণ্ডা হ। এসব কথা বাইরে বলার কি খুব দরকার? কে শুনে কী করে করে ফেলবে। চতুর্দিকে এখন সরকারী লোক ঘুরছে। দাঁড়া ট্যাক্সি ডাকি।

সৌম্য একথা বলে ট্যাক্সি ডাকতে বেরনোর মধ্যে ১জন কর্তব্যরত পুলিশ বাংলাভাষার সম্ভাব্য ঘাতকদের ১জন ভেবে কমদামি পোশাকের ফ্যাকলাকে দাঁড় করিয়েছে। বিরোধীদের দাবি মেনে পুলিশের ওপর নানা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সারা শহরে এমনিতে কেউ রাতে বেরোয় না। তায় ভাষামৃত্যু জাতীয় 'অপূরনীয় ক্ষতি' ঘটনায় স্তব্ধ জাতীর হৃদয়ে পুলিশ নামক শব্দটি একটু বেশিই ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। এদিকে প্রশ্নোত্তর চলছে

– এত রাতে কোথায়?
– বাড়ি ফিরছি?
– এরা কারা?
– দেখছেনই বন্ধু
– খোলসা করে বল নইলে...

ট্যাকসির টানে ২ ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলো ওরা। ফাঁকা ফ্যাকলাকে পুলিশের গায়ে দেখে অরিন্দম আর সৌম্য ফিরে আসে।

– কী হয়েছে। সৌম্যর ব্যারিটোন
– এর হাঁটাচলা সন্দেহজনক
– মানে?
– এ গতকাল আমাদের দমকল মন্ত্রীর বাড়ির সামনে সন্দেহজনকভাবে মুড়ি খাচ্ছিলো আর আজ মাঝরাতে হাঁটছে।
– ছেড়ে দিন দাদা, আর হাঁটবে না। কি রে আর কোনওদিন হাঁটবি? অরিন্দম একটু ব্যঙ্গ করে বলে
– বিশ্বাস করুন স্যার আর হাঁটবই না! ফ্যাকলা বলে।
– ইয়ার্কি মেরো না। বলো মাঝরাত্তিরে হাঁটছিলে কেন?
– ঘুম আসছে না স্যার!
– তাই বলে হাঁটবে?
– আমাদের ১টা নেমনতন্ন ছিলো। ফিরছি। দেখছেনই তো ট্যাক্সি ডাকছিলুম। আবার ব্যারিটোন।
– ঠিক আচে, আর যেন...
– না স্যার মুড়িও খাবো না। হাঁটা তো বন্ধই!
– মনে থাকে যেন।

২টো সাদা রঙের পোশাক রাস্তা টপকে যায়। এরা ট্যাক্সিতে ঢোকে। আজ ৩ জনেরই গন্তব্য অরিন্দমের বাড়ি। আজ অস্ত্র ঠিক করার রাত। গোটা ঘটনা প্রবাহ দেখে, আমাদের ৩ চরিত্র কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে *বাংলা* নামক শব্দটার সম্পূর্ণ লুপ্তির পেছনে আছে বলে শনাক্ত করে। এবং তারা সিদ্ধান্ত নেয় অস্ত্র তুলে নেবে! এবং সারা জীবনে আনাজ কাটা ছুরি ছাড়া আর কোনও অস্ত্র না তোলা ৩ পুঙ্গবকে কল্পনার জোগান দ্যায় ক্লাউদিয়া। সে তো বিপ্লবের দেশ থেকে আমদানি হওয়া মেয়ে। কত কত কত গৃহযুদ্ধ, কত কত কত সাম্যবাদী দল তাদের দেশে। আমাদের প্রত্যেকের মত এই ৩ জনের মধ্যে ২ জনের দুর্বলতা

আছে লাতিন আমেরিকার প্রতি। তা এ হেন বিপ্লবের অপর নাম ক্লাউদিয়া ইন্টারনেটের তস্য গলি খুঁজে উদ্ধার করে এনেছে এই ৩ পুরুষের কল্পনায় মেতে থাকার রশদ। যা এখন একটি ছাপানো কাগজ হয়ে এদের রাত নির্ঘুম করেছে।

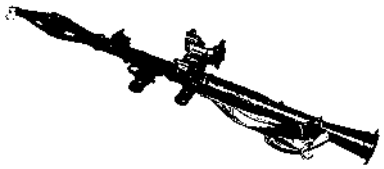

Type Rocket-propelled grenade
Place of origin Soviet Union

**Service history**

In service 1961–present

**Production history**

Manufacturer Bazalt, Defense Industries Organization, Airtronic USA
Unit cost US$3,000 (Airtronic USA)
Produced June, 1961
Variants RPG-7V2 (current model)
RPG-7D3 (paratrooper)
Type 69 RPG (China)
RPG-7USA (Picatinny Rails)
B-41 (Vietnam), (Cambodia)
Specifications
Weight 7 kg (15 lb)
Length 950 mm (37.4 in)
Caliber 40 mm (1.57 in)
Muzzle velocity 115 m/s
Maximum range~ 920 m (1000 yd) (self detonates)
Sights PGO-7 (2.7x) and UP-7V Telescopic sight)
Red Dot on Picatinny Rails

সঙ্গে ১টা ছবি। আর তার তলায় লেখা আর পি জি ৭ ক্যাপচারড বাই ইউ এস আর্মি।

সৌম্য বলে– ধরা পড়া মৃত চে গে বারার মত লাগছে।

পুরো মণীষা কৈরালা! – ফ্যাকলা বলে ওঠে উচ্ছ্বাস গড়িয়ে নামছে।

অরিন্দম প্রশ্ন করে – একেই কি হ্যান্ড গ্রেনেড বলে?

সৌম্য উত্তর দ্যায় – এটা হাত গ্রেনেড ছোঁড়ার কামান।

– আহা হুশ করে একটা আওয়াজ। আর আমাদের কাজ শেষ!
– কিন্তু নিয়ে যাবে কে? এ কি ক্লাউদিয়ার গৃহযুদ্ধ যে ঘাড়ে করে আখাম্বা কামান নিয়ে ছুটবো? ফ্যাকলা প্রশ্ন করে।
– না রে। আমাদের ট্রেনিং লাগবে। ক্লাউদিয়া শেখাবে বলেছে... সৌম্য ভাবালু
– আচ্ছা মালটা আসবে কিভাবে? আবার ফ্যাকলার প্রশ্ন
– শুনলি না ১টা ওয়েব সাইট থেকে কিনে নেওয়া যাবে! এবার অরিন্দমও বিহ্বল।
– আর ওই বিরাট দাম?
– ওরে থাম! আজ রাতটা অন্তত ভাব। স্বপ্ন দ্যাখ। সৌম্য বলে।

স্বপ্ন আর ঘুম ঘুম ভাব। এই দুলুনিতে বোঝাই গেলো না রাত্তিরটার দৈর্ঘ্য। গৃহ'যুদ্ধ পরিস্থিতি' তে সময় যে কোথা দিয়ে যায়! এরা ৩ জনই কাজকর্ম বন্ধ করেছে আপাতত। সৌম্যর নিজের ব্যবসা। সে যদিও মাঝে মাঝে গিয়ে উঁকি দিয়ে আসছে। ক্লাউদিয়ার ছুটি। পরের দিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ দ্যাখা গেলো ক্লাউদিয়া উত্তেজিত হয়ে এসে গেছে ঠেকে। যখন আমাদের পরিচিত ৩ পুরুষ চা খাচ্ছে। অরিন্দমই শুরু করে:

– কিছু ঠিক হল কীভাবে আনা হবে মালটা?
– কোনটা? ক্লাউদিয়া প্রশ্ন করে
– ওই আর পি জি ৭।
– আনা হবে মানে? আবার ক্লাউদিয়া
– মানে আমরা ওটা আনবো না তো যুদ্ধ করবো কী দিয়ে? অরিন্দম চালিয়ে যাচ্ছে।
– কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আনার ব্যাপারটা আসছে কোথা থেকে! ক্লাউদিয়া কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।
– বাহ রে! তুমি কামানটা দ্যাখালে, অত কথা হল আমাদের ভবিষ্যতের যুদ্ধ নিয়ে আর এখন বলছ আনা হবে কী করে?
– কামানটা দেখিয়েছিলুম তোমাদের কথা মত, কী কী অস্ত্র হতে পারে তা বোঝাবার জন্য। দ্যাখো আমাদের ওখানে আমার কৈশোর অব্দি এ সব অস্ত্র কোনও ব্যাপার ছিলো না। যে কোনও জায়গায় দেখেছি। কিন্তু এখানে আনবো কী করে? ক্লাউদিয়া অসহায়।
– মানে? অরিন্দম মুখ ঘুরিয়ে নেয়।
– তাহলে আমরা কী করব এখন? আমাদের লড়তেই হবে। সৌম্য বলে।
– বাল ছিঁড়ে তাল করবে! ফ্যাকলা বলে ওঠে।
– কী বলছো তোমরা আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। তোমরা সত্যি সত্যি যুদ্ধ করবে নাকি? এভাবে কেউ যুদ্ধ করতে পারে?
– তুমি শেখাবে। সৌম্য বলে
– মানে? আমি কীকরে শেখাবো?
– যাব্বাবা! তুমি গেরিলা যুদ্ধের জায়গার মানুষ, আর এটা শেখাতে পারবে না? সৌম্য বিস্মিত। অরিন্দম চুপ করে থাকতে থাকতে হঠাৎ ফুঁসে উঠলো
– বলেছিলুম, আগে জেনে নে। ক্লাউদিয়া পারবে কিনা জেনে নে!
– এ তো বার্নার্ড হয়ে গেলো রে! ফ্যাকলা বলে ওঠে।
– মানে? সৌম্যর প্রশ্ন
– মানে সহজ। ওই এখানে আফ্রিকা থেকে যারা পড়তে আসে তাদের ধরে ধরে ফুটবল খেলায়! তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত জীবনে প্রথমবার ফুটবলে শট মারছে! হাঃ!
– এটা ঠিক বলেছিস। লাতিন আমেরিকা মানেই গেরিলা যুদ্ধ। প্রতিরোধ! কত গপ্পো দিলো অরিন্দম! সৌম্য এবার রেগে গেছে।
– তোমরা কি আমায় নিয়ে এসব ভেবেছিলে নাকি? ক্লাউদিয়া বলে।
– হ্যাঁ। সৌম্য বলে।
– কিন্তু কেন? আমি ইস্পানো আমেরিকা থেকে এসেছি বলে?
– হ্যাঁ। আবার সৌম্য।
– হা হা হা হা হা হা! খুব জোরে হেসে উঠেছে ক্লাউদিয়া।
– কিছু বলো তুমি! ক্লাউদিয়াকে বলে সৌম্য
– তবে আমি একেবারে শূন্য হাতে ফেরাবো না তোমাদের।
– কিরকম? ফ্যাকলা বলে
– এটা তোমাদের খুব মনোমত হবে।
– কেন? এতে আলাদা কি আছে? সৌম্য বলে। অরিন্দম কেমন যেন থমথমে।
– এটা চে গে বারার পদ্ধতি।
– কীরকম? সৌম্য প্রশ্ন করে
– মুচি যে স্ট্যান্ডটার ওপর রেখে জুতো সারায় দেখেছো?

- ওই ৩ মুখোটা? ফ্যাকলা প্রশ্ন করে।
- হ্যাঁ। যেদিকেই ফেলো ১টা দিক উঁচিয়ে থাকবে।
- হ্যাঁ। ঠিক। সৌম্য জোড়ে।
- ঠিক ওইভাবে ৩ টে পেরেককে জুড়তে হবে। তারপর ওরকম ত্রিফলা ২০০/২৫০টা ছড়িয়ে রাখলে হাইওয়ের ট্রাকও কাত।

আবার ১টা প্রতিরোধের লালায় মাখামাখি হতে থাকে ২ জন পুরুষ। শুধু ফ্যাকলা কেমন শূন্য চোখে চেয়ে আছে জানলা দিয়ে বাইরে।

অন্ধকার যখন চেটে নিতে শুরু করে বিকেলের শেষভাগটাকে, তখন তার প্রথম লালা পড়ে গাছগুলোর ওপর: একটানা চেয়ে থাকলে দ্যাখা যায় গোটা গাছটাই সন্ধে হয়ে গেলো। তারপর অসম্ভব বিষণ্ন ট্রামের ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ। শেষ ডাইনোসরগুলো যখন মাটিতে নখ ঘষতো তখন কি এরকম আলো ঠিকরোতো? একে একে লোকে কাজ শেষ করার সংকেত বুঝত এভাবেই। ৬ এর, ৭এর , এমনকি এই সেদিনের ৯ এর দশকের গোড়া অব্দি ছিলো এই রেওয়াজ। এখন আর সেরকম হয় না। অবসন্ন টাইপ রাইটারগুলোর ওপর নাগরিক যুবতি হাতের ঢাকনা চড়ে না আর বিকেল ৫ টা নাগাদ, সরকারি দপ্তরে। হারিয়ে গেছে সেইসব রুবিরা যাদের সঙ্গে হীরা বন্দরে যাওয়া যেত! ৭ এর দশকের যুবতিরা এখন অবসরের ঘরে। কম্পিউটারে হাত লাগায় কিছু মফস্‌সলী ছেলেমেয়ে। এরকমই ১টা সরকারি অফিসের সামনে যখন দাঁড়ালো সৌম্য তখন অন্ধকার জিভটা গলিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন গাছেঢাকা গলিতে। তাদের সানি পার্ক। গলির মুখে হোর্ডিংটার হরফ পাল্টে রোমান করে দেওয়া হয়েছে। একটা কোলা কোম্পানি বলছে etaai right pachhondo dude! রাইট কি রং সৌম্য আপাতত বুঝছে না। অস্ত্রপর্ব নিয়ে বন্ধুমহলে রীতিমত ঝগড়া হয়ে গেছে। তবে ক্লাউদিয়ার কথাতেই যুক্তি খুঁজে পেয়েছে সৌম্য। আর এখন এই পাল্টে যাওয়া সময়ে বা *পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে* যখন সৌম্যর প্রায় জন্মান্ধ চলা ক্লাউদিয়ার মুখোমুখি বসিবার আয়োজনে, তখন আবার বৃষ্টি নেমেছে।

কথাবার্তা কি হল তা আমাদের খুব কি জানা দরকার? দৃশ্যত অরিন্দমের কাছ থেকে ধার করা লাল পিঁপড়েগুলো, শক্তি চট্টোপাধ্যায় না কি অন্য কারও গুলিয়ে, ছড়িয়ে যাচ্ছে সৌম্যর হাতের তালু মারফত ক্লাউদিয়ার হাতকাটা জামার বাহুতে। ওই একই সূত্রে অধমর্ণ সৌম্য ছড়িয়ে দিচ্ছে পুরুষ্টু বীজ। জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে পরস্পরের জিভে। বৃষ্টির সঙ্গে রাস্তার গম্ভীর ভিজে ভিজে চেহারার ওপর দিয়ে ভারি গাড়ি চলে যাওয়ার মত যে মিলন, একেই কি পশ্যাচার বলব? কখনও ক্লাউদিয়ার শাসক দাঁত ছিঁড়ে আনছে রক্তগন্ধ। কখনও জিভ নড়ে উঠছে অন্ধকার পলাশ যোনিতে। পিঠ ছিঁড়ে ফিরে আসা নখের মাতৃভাষা মিশে যাচ্ছে সারা মেঝেতে, সারা ঘরে।

১৫

মাস তিনেক বাদে যখন  বেশিরভাগ বাংলা খবরের কাগজ রোমান হরফে ছাপা হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি বিক্রি দৈনিক ছাপা হচ্ছে ইংরেজি ভাষায়, তখন এরকমই ১টা কাগজের উত্তরসম্পাদকীয়তে সেই বেস্ট সেলার ঔপন্যাসিক (বিক্রি ৭০০ কপি), নাতি সেলিং ঔপন্যাসিক, অপঠিত কিন্তু বহুচর্চিত প্রাবন্ধিক, ভ্যানচালক সমিতির সভাকবি সকলেই লিখতে লাগলেন বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকতা বা রোমান হরফ ব্যবহারের জয়গান। সেই ফিউশন গায়ক এফ এম এ বলছেন, আমি তো লেখার জন্য, I prefer roman script, in fact I always used the roman script, because I can't read Bengali.

এই অবস্থায় সৌম্য আর ক্লাউদিয়া একসঙ্গে থাকতে আরম্ভ করেছে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত যোগ ছিন্ন। ঠিক এরকম ১ রাতে, ভোরই বলা উচিত, বিছানায় উঠে বসে অরিন্দম। কপালে ঘাম, মাথাটা প্রায় পুরো ভিজে গেছে ঘামে। গলা ঘাড় থ্রমবোসিসে আক্রান্তের মত লাগছে। উঠে বসে, দুঃস্বপ্নের লালা কাটাতে কাটাতে সে বুঝতে চেষ্টা করে আদৌ বেঁচে আছে কি না। কী ই বা যায় আসে, বেঁচে আছে কি নেই? প্রাণ জিনিসটা গন্ধেই টের পাওয়া যায়। ভীত অরিন্দম যখন সন্ত্রস্ত খুলে দিলো পুব দিকের জোড়া জানলা, তখন জামরঙের আকাশে সুড়সুড়ি দিচ্ছে জুলাই মাসের মেঘলা হাওয়া। বস্তুত জুড়িয়ে দিচ্ছে কপালের ঘাম। দরজাটা খোলে সে। অন্ধকার সিঁড়িতে ঘুম না আসা রাতের ট্রেন যাত্রার গন্ধ। ভারতীয় রেল। তরতর করে নেমে যেতে থাকে অরিন্দম। রাস্তাটা টপকালেই লেক। ঢুকে পড়ে। তন্দ্রা কী গন্ধ কী ঘোর সে খেয়ালও করে না। হাঁটার বেগ বাড়ায় দিকজ্ঞানশূন্য।

আরেকটু দূরে ঢাকুরিয়া স্টেশনের পাশের বস্তিটায় ঘুম শব্দটা একমাত্র ফ্যাকলার ঘরেই আটকে আছে। চারপাশে সকলেই জেগে উঠেছে। আমরা যদি দরজা নামক টিন ও বাঁশের অনিখুঁত মিশ্রনটাকে ঠেলে জামরঙের দুনিয়াটাকে ভেতরে ঢোকাই, তা হলে দেখবো ফ্যাকলা বাঁ হাতটা কপালে ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার বালিশের পাশে বিপজ্জনকভাবে উঁচিয়ে রয়েছে পেরেক দিয়ে তৈরি করা মুচির ৩ মুখো স্ট্যান্ড। অন্তত ২০/২৫ টা।

এইসব দেখে উত্তেজিত হয়ে সাঁই সাঁই করে কোনও সদ্যনির্মিত অজস্রতল বাড়ির মাঝামাঝি উঠে গেলে সকালের ধোঁয়াশাহীন নগরদৃশ্যে সারি সারি রোমান হরফে লেখা গ্লোসাইনের আলো তখনও নেভেনি। সাইনবোর্ডগুলোর বাল্বও জ্বলছে। নীচে টিভি সিরিয়ালের নায়িকার নগ্ন পিঠ। তলায় রোমান হরফে লেখা বাংলা নাম।  পুব দিকের আকাশটা সম্পূর্ণ স্লেট। বৃষ্টি এলো বলে।